বস্তুবিচার।

শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত।

হুগলী।

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

পঞ্চদশ সংস্করণ।

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য ।৷০ আট আনা।

বস্তুবিচার।

শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত।

হুগলী।

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত।

পঞ্চদশ সংস্করণ।

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

১ম হইতে ১৪শ সংস্করণ পর্য্যন্ত ৫১,০০০
১৫শ " ৫,০০০

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দেশীয় সাহায্যকৃত বাঙ্গালাবিদ্যালয়সমূহে বস্তু-বিদ্যার অনুশীলন অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ঐ বিষয়ের একখানিও পুস্তক নাই। এই বিবেচনা করিয়া কয়েকখানি ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক সচরাচরপ্রচলিত ও শুশ্রূষাজনক-গুণ-সম্পন্ন কতিপয় বস্তুর আকার প্রকার প্রয়োজন ও উৎপত্তির বিবরণ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ লিখিয়া এই গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিলাম। পৃথিবীতে যে কত প্রকার বস্তু আছে, তাহার ইয়ত্তা করাযায় না, সুতরাং এই ক্ষুদ্রপুস্তকমধ্যে তাহাদের যে অতি অল্পমাত্র অংশেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য।

পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় অশেষ পরিশ্রমস্বীকার-পূর্ব্বক এই গ্রন্থের সঙ্কলনবিষয়ে আমার বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এতাদৃশ সহায়তালাভ এবং বাঙ্গালার দক্ষিণবিভাগস্থ বিদ্যালয়সমূহের অফিসিএটিং ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর হাণ্ড সাহেব মহাশয়ের সবিশেষ অনুগ্রহপ্রদর্শন না হইলে আমি এত অল্পকালের মধ্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে কোন রূপেই সমর্থ হইতাম না।

হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয় } শ্রীরামগতি শর্ম্মা।
১৫ই পৌষ সংবৎ ১৯১৫।

সপ্তম বারের বিজ্ঞাপন।

এ বারে বস্তুবিচারে ১০টী বস্তুর চিত্রময় প্রতিরূপ দেওয়া গিয়াছে, এবং গ্যালারী নিয়মে ছাত্রদিগকে একত্র দণ্ডায়মান করাইয়া কিরূপে বস্তুবিদ্যার শিক্ষা দিতে হয়, ইহার শেষভাগে পরিশিষ্ট প্রকরণে তদ্বিষয়েরও একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ঐরূপ শিক্ষার সুবি-ধার নিমিত্তই কতিপয় বস্তুর গুণাবলী স্বতন্ত্ররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ইতি।

বর্দ্ধমান ট্রেণিঙ্ স্কুল } শ্রীরামগতি শর্ম্মা।
১২ই শ্রাবণ সংবৎ ১৯২১ }

ত্রয়োদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এইবারে আরোরুট্ নীল আবির ও চতুর্থ অধ্যায়ের কর্পূরভিন্ন সমুদয়বস্তুগুলির বিবরণ কয়েকটী চিত্রসহ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে ইতি।

বহরম্পুর কালেজ } শ্রীরামগতি শর্ম্মা।
১২ই শ্রাবণ সংবৎ ১৯২৭ }

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

সূচীপত্র।

পরিশিষ্ট।

বস্তুবিচার।

প্রথম অধ্যায়।

কাচ।

কাচ অতি স্বচ্ছ পদার্থ। কাষ্ঠ প্রস্তর [illegible] বস্তু চক্ষুর উপর আবরণ করিলে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু কাচের মধ্যদিয়া সমুদায় বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত গৃহের গবাক্ষসকল সাসি দিয়া আঁটা থাকিলেও অন্ধকার হয় না। পিতল কাঁসা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যে কতকগুলি বস্তু যেরূপ কলঙ্কিয়া বিস্বাদ হইয়া যায়, কাচপাত্রে সেরূপ হয় না। এই নিমিত্ত কাচে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শে।

কাচ অতিশয় ভঙ্গ-প্রবণ। ইহার নির্ম্মিত সিসি গেলাস বাটী বোতল ঝাড় লণ্ঠন চস্‌মা প্রভৃতি দ্রব্য সকল অতি অল্পমাত্র আঘাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। কাচ যদি এরূপ ভঙ্গপ্রবণ না হইত, তাহা হইলে আমরা পিতল, কাঁসা, তামা, রূপা প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য সকলের অনাদর করিয়া উহার দ্বারাই ঘটী, বাটী, থালা, গাড়ু প্রভৃতি গৃহ-সামগ্রী সকল নির্ম্মাণ করাইয়া

সচরাচর ব্যবহার করিতাম। কারণ আর কোন দ্রব্যই কাচের ন্যায় মসৃণ, উজ্জ্বল, সুলভ ও দেখিতে সুন্দর নহে। আহা! সূর্য্যের আলোক কাচের উপর পতিত হইলে, কাচ কি চমৎকার চাক্‌চক্যশালী হইয়া উঠে!

কাচের স্বাদ গন্ধ কিছুই নাই। ইহার আর একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্য সকল যেমন এক দিক্ উত্তপ্ত হইলেই একেবারে সমুদয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কাচ সেরূপ হয় না। এক অঙ্গুলি-পরিমিত কাচ-খণ্ডের এক দিক্ ধরিয়া প্রদীপের শিখাতে অনায়াসে উত্তপ্ত করিতে পারা যায়, হস্তে কিঞ্চিন্মাত্রও তাপ লাগে না। এই গুণ থাকাতে কাচকে অপরিচালক কহা গিয়া থাকে।

হীরক ব্যতিরেকে আর কিছু দ্বারাই কাচকে কাটিতে পারা যায় না। হীরকের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অগ্রভাগটী কাচের উপর টানিলে একটী দাগমাত্র পড়িয়া যায়, অনন্তর ঘা দিলেই ঐ দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়।

পারা ও রাঙ্ এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া কাচের পৃষ্ঠে লেপিয়া দিলে উহাতে সকল বস্তুরই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে এবং ঐরূপ করা কাচকে দর্পণ কহে। সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, দর্পণের পৃষ্ঠস্থিত ঐ বস্তুটী তুলিয়া লইলে তাহাতে আর মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বালী ও এক প্রকার ক্ষার এই উভয়কে একত্র মিশ্রিত করিয়া সাতিশয় অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে উহা দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে শীতল হইলেই উত্তম কাচ প্রস্তুত হয়। একেবারে শীতল হইলে উহা

অতিশয় ভঙ্গ-প্রবণ হইয়া উঠে। উৎকৃষ্ট কাচে বালি না দিয়া একপ্রকার প্রস্তরের গুঁড়া প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, যখন ঐ পদার্থদ্বয় অগ্নির উত্তাপে গলিয়াযায়, তখন উহাকে নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিতে পারা যায়। রঞ্জিত কাচ দেখিতে অতি সুন্দর; উহা চক্ষুর উপর দিয়া দেখিলে, কাচের যে রঙ্, সমুদয় বস্তুই সেই রঙ্‌বিশিষ্ট দেখায়। কাচ দ্রবীভূত হইলে উহা দ্বারা যে প্রকার আকারের বস্তু প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা হয়; ছাঁচে ঢালিয়া সেই প্রকারই করা যাইতে পারে এবং ঐ সময়েই নানাপ্রকার কৌশলদ্বারা উহাকে মসৃণ করা গিয়া থাকে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, বৃহৎ বৃহৎ খড়ের গাদা পুড়িয়া কাচ হয়। এ কথাও অসম্ভব বোধ হয় না; কারণ খড় পুড়িলে ঐ ক্ষার এবং নিম্নস্থ বালি একত্র হইয়া কাচ হইবার বাধা নাই।

কাচের প্রথম সৃষ্টি বিষয়ে একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে। ফিনীষিয়া দেশীয় কতিপয় বণিক্ জাহাজ লইয়া বাণিজ্যার্থ গমন করিতে করিতে সীরিয়া দেশের সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ তীরজাত কালয় নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বালুকার উপরে পাক করিতে আরম্ভ করেন। পাক সমাপ্ত হইলে দেখিলেন যে, চুল্লীর মধ্যে এক প্রকার অপূর্ব্ব পদার্থ জন্মিয়া রহিয়াছে। অনন্তর তাঁহারা উহা হইতেই কাচের উৎপত্তি শিখিয়া গেলেন।

কাচ আমাদিগের দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে।

রবর।

রবর, কোমল কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ পদার্থ এবং অতিশয় দুশ্ছেদ্য, অর্থাৎ উহাকে কোন অস্ত্র দ্বারা অনায়াসে কাটা যায় না। রবরের আর একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে, দুই অঙ্গুলি পরিমিত রবরের এক দিক্ ধরিয়া টানিলে উহা ছিন্ন না হইয়া ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বকার আকার প্রাপ্ত হয়। এই গুণকে স্থিতিস্থাপক বলাগিয়াথাকে। রবর এইরূপ স্থিতিস্থাপক বলিয়াই উহার নির্ম্মিত ফিতা, জুতা, টুপি প্রভৃতিও স্থিতিস্থাপক হইয়া থাকে এবং রবরকে বলপূর্ব্বক ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠে। পেন্সিলের দাগের উপর রবর ঘষিলে ঐ দাগ উঠিয়া যায়।

এতদ্দেশীয় অনেকেই রবরকে শূকরের চর্ব্বিবোধে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা তাহা নহে,—বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস মাত্র। দক্ষিণ আমেরিকাতে বটজাতীয় দুইপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহাদেরই নির্য্যাস অর্থাৎ আঠা হইতে রবর প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ কোন অস্ত্র দ্বারা উক্ত বৃক্ষ সকলের গাত্র চিরিয়া দেয়, অনন্তর ঐ ক্ষতদেশ হইতে ক্রমশঃ যে আঠা নির্গত হয়, তাহা একত্র করিয়া তদ্দ্বারা কোন কাঁচা মৃত্তিকা-পাত্রের উপর লেপ দিতে হয়। বারম্বার লেপ দেওয়াতে উক্ত নির্য্যাস ঘনীভূত হইয়া ক্রমশঃ স্থূল হইয়া উঠে। লেপ দিবার সময়ে মৃৎপিণ্ডের আকার যেরূপ থাকে রবরও সেইরূপ হয়, অর্থাৎ মৃৎপিণ্ড গোল হইলে রবর গোলবৎ হয়, চতুষ্কোণ হইলে রবর চতুষ্কোণ হয় ইত্যাদি।

যাহা হউক অনন্তর উক্ত মৃৎপিণ্ড-সহিত নির্যাসকে কোন উচ্চ স্থানে রাখিয়া নীচে অগ্নি প্রজ্জ্বালনপূর্ব্বক ধূম দ্বারা শুষ্ক করে। উহা উত্তমরূপে শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে পর পৃষ্ঠস্থ বা অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাসকলকে জল দ্বারা গলাইয়া বাহির করিতে হয়। তাহা হইলেই প্রকৃত রবর প্রস্তুত হইয়া উঠে।

যে দেশে রবরের বৃক্ষ জন্মে, তদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই রবর দ্বারা বোতল, বাতি, জুতা ও একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াথাকে। ঐ দ্রব্য চর্ম্ম-নির্ম্মিতের ন্যায় দেখায়। শুষ্ক রবর যাহাতে গলে, তাদৃশ কোন দ্রাবকই পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিল না। সুত-রাং শুষ্ক রবর অন্য স্থানে লইয়াগিয়া তদ্দ্বারা কোন নূতন প্রকার বস্তু নির্ম্মাণ করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু এক্ষণে জানা হইয়াছে যে, রবর জল, সুরা বা অন্য কোন আরকেই দ্রব হয় না। কেবল পাথরিয়া কয়লা চোয়াইয়া যে এক প্রকার আরক * জন্মে, তাহাতেই উহা দ্রব হইয়া যায়। দ্রব হইলেই সুতরাং তদ্দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারে।

যদি রবরের ফিতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয়, তবে উক্ত দ্রাবক দ্বারা রবরকে নরম করিয়া তাহা হইতেই সূত্র সকল নির্ম্মাণ করিতে হয়, এবং ঐ সূত্রকে কেবল অথবা কার্পাসাদি অন্যসূত্রের সহিত মিলিত করিয়া বুনিলেই ফিতা বা বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রবরকে এইরূপে দ্রবীভূত করিয়া তদ্দ্বারা সন্তরণ-যন্ত্র ও বাতাসের গদি প্রভৃতি নির্ম্মিত করিয়া থাকে।

* উহার নাম অল্কোহল্।

প্রথমতঃ উক্ত দ্রাবক দ্বারা রবরকে সম্পূর্ণরূপে দ্রব করিয়া তাহা একখান বস্ত্রের এক পৃষ্ঠের উপর মাখা-ইতে হয় এবং উহার উপরিভাগে অপর একখান বস্ত্র চাপা দিয়া কল দ্বারা উত্তমরূপে ডলিতে হয়। তাহা হইলে মধ্যস্থ রবর উভয় বস্ত্রে এরূপ জমাট হইয়া যায় যে, তন্মধ্যদিয়া বায়ু বা জল কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। অনন্তর ঐ বস্ত্র থলিয়ার আকারে সেলাই করিয়া তন্মধ্যে বায়ু পূরণ করত কৌশলপূর্ব্বক ঐ বায়ুকে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই উহা ফুলিয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে সচ্ছন্দে শয়ন করাযায় এবং ঐ থলিয়া কোমরে বান্ধিয়া অগাধ জলে দণ্ডায়মান হইলেও শরীর জলে মগ্ন হয় না—ভাসিয়া থাকে।

অহিফেন।

আফিঙ্গ এক প্রকার বিষবৎ বস্তু বটে কিন্তু ইহা দ্বারা অনেক উত্তম উত্তম ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শরীরের কোন স্থানে অত্যন্ত বেদনা হইলে তাহাতে আফিঙ্গ মাখাইয়া দিলে যন্ত্রণার অনেক হ্রাস হয় এবং যাতনাযুক্ত রোগীকে উপযুক্ত পরিমাণে আফিঙ্গ খাওয়াইয়া দিলে তাহার নিদ্রাবেশ হইয়া থাকে।

আফিঙ্গ ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হইলে অমৃতের ন্যায় হয় বটে কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেবল মত্ততা জন্মা-ইবার নিমিত্ত আফিঙ্গ খাইলে উহাতে অনেক অপকার হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশীয় লোকেরা মাদক দ্রব্য সেবন অতি কুৎসিত কর্ম্ম বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা মদ্যপায়ীকে

অধার্ম্মিক জঘন্য ও অপবিত্র লোক বলিয়া ঘৃণাকরেন, তাঁহারাই স্বয়ং আফিঙ্গ বা সিদ্ধি খাইয়া মত্ত হইতে লজ্জা বোধ করেন না! মাদকতাপক্ষে আফিঙ্গ, সিদ্ধি ও মদ্য প্রভৃতিতে কি ভেদ আছে? ফলতঃ মাদক মাত্রই সেবনকরা যদি জঘন্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়, তবে পীড়ার ভান করিয়া অধিক পরিমাণে আফিঙ্গ খাওয়াও অতি গর্হিত কর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ কি?

আফিঙ্গ তিক্ত, দুর্গন্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও পিচ্ছিল অর্থাৎ চট্‌চটিয়া। আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ১।—১।। হাত উচ্চ এক প্রকার গুল্ম জন্মে, তাহারই ফলের নির্যাস হইতে আফিঙ্গ উৎপন্ন হয়। উক্ত ফলকে ঢেঁড়ি বলিয়া থাকে। ঢেঁড়িগুলি পরিপক্ক হইলে তাহা চিরিয়া দিতে হয় এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ যে নির্যাস নির্গত হয়, তাহা একত্র করিয়া কোন মৃত্তিকার পাত্রে রাখিয়া সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক হইবার সময়ে মধ্যে মধ্যে হস্ত দ্বারা নাড়িয়া দিতে হয়। অনন্তর উহা উত্তমরূপে ঘন হইলে পর প্রকৃত আফিঙ্গ প্রস্তুত হইয়া উঠে এবং উহাই পত্রাদি মধ্যে বদ্ধ করিয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

যে ফলের নির্যাস হইতে আফিঙ্গ হয়, তাহার অভ্যন্তরে শর্ষপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও শুভ্রবর্ণ একপ্রকার দানা জন্মে। উক্ত দানাকে পোস্তদানা কহে। পোস্ত আমরা অনেক দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া আহার করিয়া থাকি। উহা মৎস্যের অণ্ডের ন্যায় খাইতে অতি সুস্বাদ লাগে। উহা হইতে এক প্রকার তৈল হয়।

চা।

চা আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে ব্যবহৃত ছিল না। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত আদরপূর্ব্বক ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, চা শরীরের জড়তা নষ্ট করিয়া সজীবতা সম্পাদন করে, বিলক্ষণ কোষ্ঠ-শুদ্ধি রাখে এবং ইহা খাইয়া অধিক রাত্রি জাগরণ করিলেও কষ্ট বোধ হয় না।

চা বৃক্ষ।

যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে এতদ্দেশীয় অনেক যুবকগণ চা খাইবার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ অত্যুষ্ণ জল কোন পাত্রে রাখিয়া তাহাতে গোটাকত চা দিয়া পাত্র আচ্ছাদন করিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে উক্ত আবরণ খুলিলেই দৃষ্ট হয় যে, জল ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে। তখন তাহার পাতাগুলি ছাঁকিয়া ঐ জলে দুগ্ধ, চিনি বা মিছরি দিয়া উষ্ণোষ্ণ খাইলেই চা খাওয়া হয়।

চীন জাপান শ্যাম ও (এক্ষণে) আসাম দেশে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মে, তাহারই পত্র হইতে চা প্রস্তুত হয়। চা জন্মিবার ভূমি কিঞ্চিৎ পার্ব্বতীয় হইলে ভাল হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে উক্ত বৃক্ষের

বীজ সকল বপন করিয়া থাকে। কিছু দিন গত হইলে চারা সকল অপর ক্ষেত্রে রোপণ করে। বৃক্ষ সকল জন্মিয়া তিন বৎসরের পর অবধি ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত পত্র প্রদান করে। অনন্তর ক্রমশঃ নিস্তেজঃ হইলে উহাদিগকে কাটিয়া ফেলে।

চার পত্রগুলি প্রায় আমাদের এতদ্দেশীয় কামিনীফুলের পাতার ন্যায়। পত্র সকল আহরণ করিয়া প্রথমতঃ একবার উষ্ণ জলের বাষ্পেতে ঝল্‌সিয়া লয়। অনন্তর উহাদিগকে লৌহ কটাহে নিক্ষেপ করত অগ্নির উত্তাপে ঈষৎ উষ্ণ করে। পরে বাজ্‌রা করিয়া রৌদ্রের উত্তাপে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইলেই চা প্রস্তুত হয়।

চা দুইপ্রকার কৃষ্ণ ও হরিতবর্ণ। এই বর্ণভেদের প্রকৃত কারণ নিশ্চয় বলিতে পারাযায় না। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, চা-জাতীয় দুইপ্রকার বৃক্ষ আছে, একপ্রকার হইতে হরিতবর্ণ এবং অপরপ্রকার হইতে কৃষ্ণবর্ণ চা উৎপন্ন হয়। কিন্তু অপরে কহেন যে, চার বৃক্ষ এক-প্রকার বই নাই, তবে কেবল শুষ্ক করিবার প্রকারভেদেই উক্ত বর্ণভেদ হইয়াথাকে।

শর্করা।

আমরা সচরাচর যে সকল সুখাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া থাকি, সে সকল শর্করা অর্থাৎ চিনির দ্বারা প্রস্তুত। চিনি ব্যতিরেকে কোন বস্তুই মিষ্টস্বাদ হয় না। ইক্ষু হইতেই কেবল চিনি উৎপন্ন হয় এমত নহে, খর্জ্জুর বিটুপালঙ্ ও অন্যান্য উদ্ভিদ্ হইতেও চিনি জন্মিয়া থাকে। রম্ভা, কাঁঠাল, আম্র, আঙুর প্রভৃতি সমুদয়

সুখাদ্য ফলেও চিনির অংশ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কৌশলদ্বারা ঐ সকল দ্রব্য হইতে চিনির ভাগ পৃথক্ করিয়া বাহির করিতে পারেন কিন্তু ঐ চিনি এত অল্প পরিমাণে জন্মে যে, তদ্দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য হইতে পারে না। তাঁহারা আরও কহিয়া থাকেন যে, প্রাণীদিগের শোণিত অস্থি এবং স্তন্য দুগ্ধে চিনির অংশ আছে। ইক্ষু ও খর্জ্জূরের রস হইতেই অধিকাংশ চিনি উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ইক্ষুজাত চিনিই অতি উত্তম ও সচরাচর ব্যবহৃত।

ইক্ষু মাড়িয়া রস বাহির করিয়া জ্বাল দিলেই গুড় হয়। ঐ গুড় উত্তমরূপে ক্লেদ-শূন্য করিয়া লইলেই চিনি হয়। চিনি প্রস্তুত করিবার নানারূপ প্রথা আছে; তন্মধ্যে এক প্রকার এই যে, উত্তম সার গুড় পেতেতে ফেলিয়া ২।৩ দিন রাখিতে হয়। ইহাতে তাহার সোট সকল নির্গত হইলে পর তাহাতে জলের ছিটা দিয়া পুষ্করিণীতে জাত এক প্রকার শৈবাল তদুপরি চাপা দিতে হয়। ঐরূপ ৭।৮ দিবস থাকিলেই উপরিস্থ গুড় গুলি কিঞ্চিৎ শুভ্রবর্ণ হইয়া উঠে। অনন্তর সেই গুলি চাঁচিয়া লইয়া অবশিষ্টের উপর শেওলা চাপা দিতে হয়। এইরূপে সমুদয়গুলি শুভ্রবর্ণ হইলে তাহা খোলায় চড়াইয়া জ্বাল দিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার উপরিভাগে জলমিশ্রিত দুগ্ধ প্রদান করিতে হয়। এইরূপ করাতে উহার সমুদায় মল অর্থাৎ গাদ্‌গুলি উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে। প্রথম দিন গাদ না কাটিয়া অগ্নি হইতে নামাইয়াই একটা কিছু চাপা দিয়া রাখিতে হয়। পরদিন অগ্নিতে চড়াইয়া পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ প্রদানপূর্ব্বক সমুদয়

গাদ তুলিয়া ফেলিতে হয়। অনন্তর অগ্নি হইতে নামাইয়া খোলার গাত্রে তাড়ু দ্বারা মর্দ্দণ করিতে করিতে উহা জমিয়া যায়। পরে সেইগুলি কাষ্ঠের তক্তার উপর ফেলিয়া কাষ্ঠের লোড়া দিয়া বাটিলেই উত্তম চিনি প্রস্তুত হয়।

এক্ষণে ইউরোপীয়েরা অনেক স্থানে কলের দ্বারা গুড়কে ক্লেদ-শূন্য করিয়া চিনি প্রস্তুত করিতেছেন।

মিছরি চিনি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। উহা প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা চিনি হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাগুদানা।

সাগুদানা অতি লঘু বস্তু। যে দিন অধিক আহার করা পথ্য নহে, চিকিৎসকেরা সেই দিন সাগু জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে কহিয়া থাকেন। সাগুর দানা গোলাকার, সরিসা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; বর্ণ শুভ্র। তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে সাগু দিলে উত্তম পায়স হয়। সাগু দুই প্রকার প্রস্তুত হয়। একপ্রকার উক্ত সরিসার ন্যায়, অপরপ্রকার মোটা রুটীর ন্যায়। সরিসার ন্যায় সাগুই এদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাগুর বিষয়ে আমাদের দেশীয় লোকেরা নানা কথা কহিয়াথাকেন। কেহ কেহ বোধকরেন যে, সাগু অন্নের শুষ্ক মণ্ড; কৌশল দ্বারা দানার আকারে প্রস্তুত হয়। তাঁহারা এই বোধে সাগুকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া কদাচ ব্যবহার করেন না। আবার সাগুকে শস্যের বীজ বলিয়া অনেকের ভ্রম আছে। কিন্তু সাগু অন্নের মণ্ড বা শস্যের বীজ কিছুই নহে, উহা বৃক্ষবিশেষের মজ্জা মাত্র।

মলক্কস্ ও ফিলিপাইন্‌পুঞ্জ নামক দ্বীপ সমূহে তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহারই মজ্জা হইতে সাগু প্রস্তুত হয়। উক্ত বৃক্ষসকল ঐ দেশে ১৭। ১৮ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। সাগুবাহির করিতে হইলে বৃক্ষকে ছেদন করিয়া লম্বালম্বি চিরিয়া মজ্জাটা বাহির করিয়া লইতে হয়। অনন্তর ঐ মজ্জাকে চূর্ণ করত চালনী দ্বারা উত্তমরূপে চালিয়া জলে গুলিয়া মণ্ডের মত করিতে হয়। ঐ মণ্ডকে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইলেই রুটীর মত বা দানার মত সাগু প্রস্তুত হইয়া উঠে।

সাগু বৃক্ষ।

সাগু পূর্ব্বকালে এদেশে প্রচলিত ছিল না। এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্দেশীয় অনেক ধনী লোকেও উক্ত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া আপন আপন উদ্যানে রোপণ করিতেছেন।

হিঙ্গু।

হিঙ্ তিক্ত, ঝাল, পিচ্ছিল ও সাতিশয় দুর্গন্ধ। ইহার বর্ণ কাপিশ অর্থাৎ মেটিয়া। কাটিলে পর

অভ্যন্তরভাগ কিঞ্চিৎ শুভ্রবর্ণ দেখায়। কিন্তু কিয়ৎ-ক্ষণ বাতাস লাগিলেই আরক্তবর্ণ হইয়া উঠে। ইহাকে জলের সহিত গুলিতে পারা যায়, কিন্তু গুঁড়া করা সহজ নহে।

হিঙ এতাদৃশ দুর্গন্ধ হইলেও ইহাতে আমাদের অনেক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হিঙ খাইলে ধাতু রক্ষা ও বলাধান হয়, শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হয় এবং উদরাময়, জাড্য ও ব্যাপক কফ কাশী প্রভৃতি নানা রোগে হিঙ দ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় অনেক লোকে সুস্বাদু বোধে সূপ ও অন্যান্য ব্যঞ্জনের সহিত হিঙআহার করিয়া থাকে। অনেক পশুর মাংস হিঙদ্বারা উত্তম সিদ্ধ হয়।

হিঙ্গু বৃক্ষ।

অন্যপ্রকার।

রবরের ন্যায় হিঙ্গু ও বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস। ঐ সকল বৃক্ষ পারস্য ও তাহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশে জন্মিয়া থাকে। উহার পত্র এক হাত ও গুঁড়ি ৫।৬ হাত লম্বা হয়। হিঙ প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত বৃক্ষের মূলদেশের মৃত্তিকাসকল খনন করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। সিকড় বহির্গত হইলে তাহা অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া দিয়া তন্নিম্নে কোন পাত্র পাতিয়া রাখে, অনন্তর ঐ পাত্রে দুগ্ধের ন্যায় যে রস নির্গত হইয়া পড়ে, তাহাই শুষ্ক করিয়া লইলে হিঙ হয়।

এতদ্দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, হিঙ খনি হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই খনিতে ম্লেচ্ছ জন্তু পড়ে, তাহাও গলিয়া হিঙের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এই জ্ঞান থাকাতে অনেকে হিঙকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। বোধ হয়, হিঙ পচা বস্তুর ন্যায় অতিশয় দুর্গন্ধ, এই কারণ হইতেই উক্ত প্রবাদ কল্পিত হইয়া থাকিবে।

কাফি বৃক্ষ।

চা খাওয়ার ন্যায় কাফি খাওয়ার ব্যবহারও এদেশের অনেক স্থানে চলিত হইয়া আসিতেছে। কাফি এক প্রকার ফলের বীজ। উহা ভাজা হইলে কপিলবর্ণ সুগন্ধি ও খাইতে সুস্বাদ হয়। কিন্তু কাঁচাকাফি ঈষৎ পীতবর্ণ হয় এবং উহার স্বাদ বা গন্ধ উত্তম নহে।

আরব ও আমেরিকার কোন কোন উষ্ণপ্রধান প্রদেশে কাফি জম্মিয়াথাকে। উহার বৃক্ষসকল নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় না। জম্মিয়া দুই বৎসরের পর অবধি উহার ফল হইতেথাকে। ফলগুলির আকার প্রায় মটরের ন্যায়। ফল পাকিলে গাছ নাড়া দিয়া ফল একত্র করিয়াথাকে। অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উপরিভাগের ছালগুলি ছাড়াইয়া ফেলিলেই ভিতর হইতে দাউলের ন্যায় হইয়া যে বীজ নির্গত হয়, তাহাই বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়।

কাফি খাইতে হইলে, প্রথমতঃ উহার বীজগুলিকে উত্তমরূপে খোলায় ভাজিয়া চূর্ণ করিতে হয়, এবং সেই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত ফুটাইয়া ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলেই কাফিখাওয়া হয়। কাফি খাইলে শরীরে কিঞ্চিৎ বলাধান ও ধাতু রূক্ষ হয় এবং তজ্জন্য রজনীতে অধিক নিদ্রা হয় না।

কাফির উক্তরূপ গুণ প্রকাশিত হইবার বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস আছে। আরবদেশীয় কতিপয় পশু-পালক দেখিয়াছিল যে, তাহাদিগের যে যে পশু কাফিবৃক্ষের ফল খাইত, তাহারা রজনীতে অধিক নিদ্রা যাইত না এবং প্রফুল্লচিত্তে ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত; তাহারা এই সংবাদ সন্নিহিত ধর্ম্মোপাসক-দিগকে জানাইলে পর তাঁহারা সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিলেন যে, কাফির যথার্থই উক্তরূপ গুণ আছে। অনন্তর কাফির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে নানাদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতে লাগিল।

আরোরুট্।

আরোরুট্ সাগুর ন্যায় অথবা সাগু অপে-ক্ষাও লঘুপাক দ্রব্য। অত্যন্ত লঘু আহারের ব্যবস্থা হইলে চিকিৎসকেরা আরোরুটেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন। অনেক ধনবান্ লোকে দুগ্ধপোষ্য শিশু-দিগকে অন্ন বা তদ্রূপ-গুরু আহার ধরাইবার পূর্ব্বে অনেক দিন আরোরুট খাওয়াইয়া রাখেন। উদরের অজীর্ণ দোষে আরোরুটই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ্য। আরোরুট লঘু ও অতিশয় পুষ্টিকর অথচ খাইতেও বিস্বাদ নহে।

আরোরুট চূর্ণ, শুভ্রবর্ণ ও দেখিতে ময়দার মত। অল্পমাত্র আরোরুটচূর্ণ জলে গুলিয়া সেই জল অ-ত্যুষ্ণ জলে বা দুগ্ধে প্রক্ষেপ করত আবর্ত্তিত করিতে করিতে যখন ঐ আরোরুটের বর্ণ উক্ত জল বা দু-গ্ধের বর্ণের সহিত মিশ্রিত ও এক হইয়া যাইবে,

তখনই আরোরুটের পাক সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঐ আবর্ত্তিত তরল ও উষ্ণ আরোরুটের সহিত চিনি বা মিছরি মিশ্রিত করিলেই উহা আহারোপ-যোগী হয়।

আরোরুট একপ্রকার গুল্মের মূল হইতে প্রস্তুত হয়। ঐ গুল্ম আর্দ্রক ও হরিদ্রা গাছের সজাতীয়। আদা ও হরিদ্রা যেরূপ তত্তদ্‌গুল্মের মূল, আরোরুটও অবিকল সেইরূপ। ঐ মূল ভূমি হইতে তুলিয়া জলে ধৌত করিয়া ছুরি দ্বারা ছালশূন্য করে, পরে উহাকে ঢেঁকি বা জাঁতা দ্বারা চূর্ণ করিয়া চালনী দিয়া চালিয়া লয়। অনন্তর উহাকে নির্ম্মল জলে বারংবার প্রক্ষালিত করিয়া উহার পালোভাগটা বাহির করিয়াথাকে এবং তাহাই শুষ্ক হইলে আরোরুট প্রস্তুত হয়। ইউরোপীয়েরা উত্তম যন্ত্রের দ্বারা উহা প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

'আরোরুট' ইহা বাঙ্গালাশব্দ নহে—ইঙ্গরেজি শব্দ। ইহা দ্বারাই দেখাযাইতেছে যে, এই বস্তু এদেশীয় নহে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে এই গাছ স্বভাবতঃ বহুল-পরিমাণে জন্মিয়াথাকে। তন্মধ্যে সেণ্টভিন্সেণ্ট ও বর্মুডা দ্বীপে আরোরুটের চাস ও পালো প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় অনেক আছে। এক্ষণে বর্দ্ধমান বীরভূম মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার অনেক প্রদেশেও আরোরুটের চাস আরব্ধ হইয়াছে এবং প্রচুর পরিমাণে উহা উৎপন্ন হইতেছে। আদা হরিদ্রা কচু প্রভৃতির ন্যায় এক বৎসরের মধ্যেই, উহার চাস সমাপ্ত হয়।

গোলআলু গোম প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুরও পালো প্রস্তুত হয় কিন্তু উক্ত কোন পালোই আরোরুটের ন্যায় অধিক পুষ্টিকর নহে।

চন্দন।

চন্দনকাষ্ঠ আমরা দেবার্চ্চনার জন্য সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়াথাকি। ইহার স্বাদ ঈষৎ তিক্ত, কিন্তু গন্ধ অতি মনোহর।

ঐ কাষ্ঠের মধ্যে একপ্রকার তৈল থাকে, গন্ধ সেই তৈল হইতেই উদ্‌ভূত হয়। উক্ত তৈল অনেক চিত্রকর্ম্মে লাগে এবং দেখিতে ঠিক আতরের ন্যায়। অতএব শঠ বণিকেরা আতরের সহিত উক্ত তৈল মিশ্রিত করিয়া লোকের নিকট আতর বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

চন্দন কাষ্ঠের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি অতি উৎকৃষ্টরূপ মসৃণ হইতে পারে। দেশীয় চিকিৎসকেরা অতিশয় বিকারের রোগীকে চন্দনকাষ্ঠের গুঁড়া খাওয়াইয়া থাকেন। আর্দ্র চন্দন স্নিগ্ধকর ও অতিশয় সুশীতল। ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মসম্বন্ধীয় রোগে চন্দন মাখিলে অনেক উপকার হয়।

চন্দনকাষ্ঠ তিনপ্রকার হয়—শ্বেত, পীত ও লোহিত। কেহ কেহ কহিয়াথাকেন যে, শ্বেত ও পীত চন্দন এক বৃক্ষেরই কাষ্ঠ। উক্ত বৃক্ষের উপরিভাগের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ ও অভ্যন্তরের সারভাগ পীতবর্ণ হয়। লোহিতবর্ণ চন্দনের ভিন্নজাতীয়

বৃক্ষ আছে। লোহিতচন্দনের গন্ধ প্রায় অনুভূত হয় না।

এতদ্দেশীয় অনেকের সংস্কার আছে, চন্দনের বিশেষ বৃক্ষ নাই, বায়ুবিশেষের সংস্পর্শ দ্বারা সকল বৃক্ষই চন্দনের গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু এ সংস্কার কেবল ভ্রমমাত্র; লঙ্কা ও করমণ্ডল উপকূল প্রভৃতি অনেক স্থানে উক্তজাতীয় বৃক্ষ অনেক জন্মিয়া থাকে।

টার্পিন—ধুনা—আলকাতরা।

এই ত্রিবিধ দ্রব্যই এক প্রকার বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত বৃক্ষ সকল দেবদারুজাতীয়, কিন্তু উহাদের প্রকারভেদ অনেক আছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশে উক্তজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহাকে তদ্দেশে কেলুবৃক্ষ বলে। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় ইহারই নাম সর্জ্জতরু। কেলুবৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ; শাখাসকল অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়াথাকে। পত্র সকল ঝাউপাত্রের ন্যায়, কিন্তু তাদৃশ দীর্ঘ নহে। এই বৃক্ষের পুষ্প দেখা যায় না, ফল অতি জঘন্য হয়।

উক্ত বৃক্ষের নির্যাসেই ঐ তিন বস্তু জন্মিয়া থাকে। ঐ নির্যাস কোন কোন বৃক্ষের শাখা হইতে নির্ম্মল সলিলের ন্যায় স্বয়ং নিঃসৃত হয়, কোন কোন বৃক্ষের অগ্রভাগ চিরিয়া দিলে তথা হইতে বহির্গত হয়, আর কোন কোন বৃক্ষের গুঁড়িতে ছিদ্র করিয়া দিলে ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া আইসে। এই সকল নির্যাস উজ্জ্বল,

ঈষৎস্বচ্ছ ও শ্বেত পীত প্রভৃতি নানাবর্ণ হয়। ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র ও কিঞ্চিৎ মনোরম; স্বাদ তিক্ত। এই নির্যাসে এক প্রকার তৈল থাকে, তাহা উড়িয়া গেলে নির্যাস কঠিন হইয়া উঠে।

উক্ত নির্যাস হইতে অগ্নিসংযোগে চোয়াইয়া যে তৈল বাহির করা যায়, তাহাকে টার্পিন তৈল বলা গিয়া থাকে। টার্পিন অতিশয় তরল, নির্ম্মল ও ঈষৎ পীতবর্ণ হয়; ইহা জলের সহিত প্রায় মিশ্রিত হয় না। নানাবিধ রঙে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক ঔষধের কার্য্য করিয়াথাকে। বিরেচক ঔষধের সহিত কিঞ্চিৎ টার্পিন মিশ্রিত করিয়া দিলে উদরস্থ ছোট কৃমি সমুদায় মরিয়া যায়।

পূর্ব্বে যে নির্যাসের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে তৈল পৃথক্ হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই ধুনা বা রজন কহা যায়। কোন কোন স্থলে তৈল নির্যাসহইতে স্বয়ংই বহির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর অগ্নি দ্বারাই বাহির করিতে হয়। রজন বা ধুনাকে জলের সহিত মিশ্রিত করিতে পারা যায় না, কিন্তু অগ্নিতে দিলেই গলিয়া একপ্রকার মনোরম গন্ধ উৎপাদন করত পুড়িয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত দেব-দারুজাতীয় বৃক্ষসকল নানাপ্রকার হওয়াতে টার্পিন-তৈল এবং ধুনাও নানাপ্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকার ধুনা রজন নামেই প্রসিদ্ধ আছে। গুগ্‌গুলও ধুনার এক প্রকারভেদ মাত্র।

আলকাতরাও ঐ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বৃক্ষসকলকে খণ্ডখণ্ডরূপে কর্ত্তন করিয়া জলপূর্ণ কোন পাত্রের মধ্যে পুরিতে হয়, পরে ঐ পাত্রের মুখ-

ভাগে একটী নল দিয়া অবশিষ্ট সমুদয় ভাগ আচ্ছাদন করত ঐ নল অপর কোন জলোপরিস্থ শীতল শূন্যপাত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া পাত্রের মুখ আঁটিয়া দিতে হয়। অনন্তর প্রথম পাত্রের তলভাগে জ্বাল দিলেই উহার অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠের রসসকল বাষ্পের আকারে উদ্গাত হইয়া অপর শূন্যপাত্র মধ্যে প্রবেশ করত আল-কাতরার আকার ধারণ করে। (১)

আলকাতরা কৃষ্ণবর্ণ, তরল কিন্তু কিঞ্চিৎ গাঢ়। ইহা জলের সহিত মিশ্রিত হয় না। চিটাগুড় ও তৈলে মিশিয়া যায়। কাষ্ঠাদিতে আলকাতরা মাখাইয়া রাখিলে উহা শীঘ্র নষ্ট হয় না, এই নিমিত্ত নৌকা এবং গৃহের কপাট ও ছাদের কড়ি প্রভৃতিতে আলকাতরা মাখা-ইয়া রাখে।

পিচ নামে আর একপ্রকার আলকাতরা আছে। কেবল প্রস্তুত করিবার ভেদেই পিচ অধিক গাঢ় হইয়া থাকে। গৃহের ছাদের উপরিভাগে গাঢ়রূপে পিচ মাখাইয়া রাখিলে উক্ত ছাদ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় না। অপর, আলকাতরায় যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, পিচেও প্রায় সেই সকল হইয়া থাকে।

কাগজ।

কাগজের সৃষ্টি হওয়াতে মনুষ্য-সমাজের সভ্যতার যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পূর্ব্বকালে কাগজ না থাকাতে তালপত্রেই

(১) এইরূপ প্রক্রিয়াকে চোয়ান কহে।

পুস্তকাদি লিখিত হইত। কিন্তু তাহা যে, অতিশয় অসুবিধাজনক ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। অনেকে অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে চীন দেশে কাগজের প্রথম সৃষ্টি হয়, কিন্তু উহা ভারতবর্ষে যে কতদিন প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। বোধ হয় মুসলমানেরাই এদেশে কাগজের প্রথা প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। তৎপূর্ব্বে কাগজের সমুদায় কার্য্য তালপত্র ও ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতি বৃক্ষের পত্র ও ত্বক্‌দ্বারাই সম্পন্ন হইত। বোধ হয়, এই জন্যই অদ্যাপি চিঠিকে পত্র বলিয়া থাকে এবং উড়িষ্যা দেশের লোক সকল অদ্যাপি তালপত্রেই সমুদায় লিখিয়া থাকে। যাহা হউক, এই মহোপকারক বস্তু যে, কি প্রকারে প্রস্তুত হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই বাসনা হয়। বোধ হয়, ইহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াও থাকিবেন, উহা এইরূপ—

ছিন্ন বস্ত্র, পাট ও শণ ইহাদিগের হইতেই সচরাচর কাগজ প্রস্তুত হয়। উক্ত বস্ত্রাদির সূত্রসকল যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইতে কাগজও সেইরূপ উত্তম হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রথমতঃ বস্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বাছিতে হয়, পরে উহাদিগকে উত্তমরূপে কাচিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছিঁড়িতে হয়। অনন্তর উহাদিগকে ঢেঁকিতে কুটিয়া, পুনর্ব্বার জলে ফেলিয়া পরিষ্কৃত ও মণ্ডের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ করাতে মণ্ডগুলি শুভ্রবর্ণ হইয়া উঠে, তখন উহাকে ঈষৎ উত্তপ্ত জলের সহিত গুলিতে হয়। অনন্তর সূক্ষ্ম শলাকা বা লৌহতারে বাড়বোনার ন্যায় নি-

র্ম্মিত এক প্রকার ছাঁচে করিয়া ঐ গোলামণ্ডকে জল হইতে এরূপে ক্রমে ক্রমে তুলিতে হয় যে, উক্ত বাড়ের সকল অংশে মণ্ডটী সমভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। ঐ রূপে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া রাখিলেই উহার জলভাগ ছাঁকনির ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তখন উহাকে নীচে নামাইয়া রাখিলে কাগজের আকারেই থাকে। এইরূপে উপর্য্যুপরি অনেক রাখা হইলে উহার উপরিভাগে চাপ দিয়া অবশিষ্ট জলভাগ বাহির করিয়া এক এক খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ শুষ্ক করিতে দেয়। শুষ্ক হইলে পর উহাতে ভাতের বা অন্যান্য দ্রব্যের মাড় মাখাইয়া পুনর্ব্বার শুখাইতে হয়। মাড় না দিলে কাগজ অতিশয় চুপ্‌সিয়া যায়। তাহাতে কালী কোন প্রকারেই স্থির থাকে না। অনন্তর উহাদিগের প্রান্তভাগ সকল সমানরূপে কাটিয়া ও উপরিভাগ ঘুঁটিয়া দিস্তা বাঁধিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

বস্ত্র ছিন্নকরা, ধৌতকরা ও কোটা প্রভৃতি যে সকল কার্য্য অস্মদ্দেশীয় লোকেরা হস্ত ও সামান্য যন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উত্তম কলের দ্বারা সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করত কাগজ করিবার যে কত সুবিধা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা যে তুলট ব্যবহার করেন, তাহা এই কাগজেই কাইবীজের মণ্ড দিয়া প্রস্তুত হয়। উক্ত মণ্ডে নানারূপ রঙ্ ও কিঞ্চিৎ সেঁকো বিষ মিশ্রিত থাকে। সামান্য কাগজ অপেক্ষা তুলট পুরু ও অধিককালস্থায়ী হয় এবং উহাতে সেঁকো মিশ্রিত থাকাতে পোকায় কাটিতে পারে না।

এক্ষণে নানাপ্রকার কাগজ সৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সকলই ঐ একরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা প্রস্তুত হয়। উপাদান ও উপকরণ সামগ্রীর তারতম্য অনুসারে কাগজ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাগজ তুলিবার সময়ে মণ্ডের সহিত যেরূপ বর্ণ মিশ্রিত করা যায়, কাগজ সেই বর্ণের হইয়া থাকে। চীনদেশীয় লোকেরা কাঁচাবাঁশের চূর্ণ ও কয়েকপ্রকার বৃক্ষের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনের কাগজ অতিশয় পাতলা হয়। উহারা কোন বিস্তৃত আধারের উপরিভাগে প্রসারিত করিয়া কাগজ শুখাইতে দেয় এবং মণ্ডাদি উপরপৃষ্ঠেই দিয়া থাকে; এই নিমিত্ত ঐ সকল কাগজের এক পৃষ্ঠ যেরূপ মসৃণ হয়, অপর পৃষ্ঠ সেরূপ হয় না।

চর্ম্ম দ্বারাও এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ কাগজকে পার্চমেণ্ট কহে। মেষ বা ছাগলের চর্ম্ম লোম-শূন্য করিয়া চূণের জলে ভিজাইয়া রাখে। অনন্তর উহার মাংসভাগসকল উত্তমরূপে চাঁচিয়া চর্ম্মখানিকে বিলক্ষণ পাতলা করে। পরে ঐ চর্ম্মকে ঝামার ন্যায় এক প্রকার প্রস্তর দ্বারা মসৃণ করিলেই পার্চমেণ্ট প্রস্তুত হয়। অন্য সকল কাগজ অপেক্ষা পার্চমেণ্ট দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।
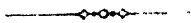
দ্বিতীয় অধ্যায়।

কস্তূরিকা।

কস্তূরিকা বা মৃগনাভির গন্ধ অতিশয় তীব্র; ইহার মনোহর গন্ধ এত ব্যাপককালস্থায়ী হয় যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অর্দ্ধরতিপ্রমাণ কস্তূরিকার গন্ধে প্রশস্ত গৃহও বিংশতিবৎসর পর্য্যন্ত আমোদিত থাকিতে পারে। অন্যান্য দ্রব্য হইতে কৌশলপূর্ব্বক গন্ধবৎ পদার্থটা পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, মৃগনাভি হইতে এপর্য্যন্ত তাহা কোন প্রকারেই পারা যায় নাই।

ভারতবর্ষের হিমালয়প্রদেশে এবং চীন রুষিয়া প্রভৃতি জনপদে শৃঙ্গবিহীন একপ্রকার হরিণ জাতি আছে। তাহাদিগের পুংজাতির নাভির অতি সন্নিহিত ভাগেই ঐ অপূর্ব্ব মনোহর বস্তু জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর উহাকে মৃগনাভিই বলা যায়।

কস্তূরিকা মৃগ।

চর্ম্মযুক্ত মৃগনাভির নিম্নভাগ অণ্ডাকার ও উপরিভাগ সমতল। চর্ম্মের লোমগুলি উহার উপরিভাগে গোলাকারে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকে, ঐ লোমের নীচে দুই পুরু চর্ম্ম থাকে, সেই চর্ম্মের নিম্নভাগে এলাইচ

দানার মত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা পাওয়া যায়, তাহাকেই মৃগনাভি বা কস্তূরিকা বলে।

মৃগনাভি আমাদিগের অনেক ঔষধের কার্য্য করে, বিকারের রোগীর নাড়ী সকল যখন নিশ্চল হইতে থাকে, তখন উহাকে দুই এক দানা মৃগনাভি খাওয়াইয়া দিলে অনেক উপকার দর্শে। মৃগনাভি অতিশয় পুষ্টিকর; অতি দুর্ব্বল রোগীদিগকে মৃগনাভি খাওয়াইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের বলাধান হয়।

মৃগনাভি অতি বিবেচনাপূর্ব্বক উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করিতে হয়, কারণ প্রতারক লোকেরা উহাদিগকে সচরাচর কৃত্রিম করিয়া থাকে। শুষ্ক রক্তবিন্দুর সহিত মৃগনাভির অনেক সাদৃশ্য আছে। এই হেতু উক্তরূপ রক্তবিন্দু সকল, এমোনিয়া ও কিঞ্চিৎ মৃগনাভিতে সংযুক্ত করত চর্ম্মবদ্ধ করিয়া কৃত্রিম মৃগনাভি প্রস্তুত করে, কিন্তু ঐ চর্ম্মের উপরিস্থ লোম সকল প্রকৃত মৃগনাভির লোমের ন্যায় কখনই গোলাকারে অবস্থিত হয় না, সুতরাং ইহাই পরীক্ষা করিবার এক বিলক্ষণ উপায়।

অস্মদ্দেশে কস্তূরিকামৃগবিষয়ে এইরূপ এক প্রবাদ আছে যে, উহাদিগের পায়ের আঁটুর খিল নাই, সুতরাং উহারা শয়ন করিলে আর উঠিতে পারে না এবং ব্যাধেরা কৌশলপূর্ব্বক উহাদিগকে শোওয়াইয়াই ধরিয়া থাকে, কিন্তু একথা সম্পূর্ণই অলীক। সামান্য হরিণদিগের যেরূপ শরীরের আকার, উহাদিগেরও অবিকল সেইরূপ, কেবল উহাদের শৃঙ্গ নাই এইমাত্র প্রভেদ।

মৃগনাভির ন্যায় আর একপ্রকার গন্ধদ্রব্য নকুল-জাতীয় একপ্রকার জন্তুর শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ জন্তুর নাম পুষ্যলক বা গন্ধগোকুলা। এদেশের স্থানে স্থানে উহাদিগকে পাওয়া যায়। উহারা পুষিলে পোষ মানে। উহাদিগের গুহ্যদেশের নিম্নভাগে কোন স্থানে একটী চর্ম্মের থলির ন্যায় হয়, তাহাতে একটী ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রদ্বারা মধ্যে মধ্যে মধুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়। তাহাই অস্মদ্দেশে খটাসীনামে প্রসিদ্ধ। খটাসী আমাদিগের অনেক পাকতৈলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার গন্ধ প্রায় মৃগনাভির ন্যায় কিন্তু তাদৃশ তীব্র নহে।

রেসম।

আমরা সচরাচর তসর, গরদ, শাটিন প্রভৃতি যে সকল অপূর্ব্ব কৌষেয় বসন ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা এক প্রকার কীটের লাল মাত্র। উক্ত কীটকে এতদ্দেশে গুটিপোকা বলিয়া থাকে। উহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন জাতি অনুসারে শরীর-গত বর্ণও হরিত পীত শুক্লাদি নানাপ্রকার হয় এবং ঐ বর্ণের উপরি-ভাগে সুবর্ণবৎ উজ্জ্বল নানাবিধ চিহ্ন থাকে। পূর্ণাবস্থ পোকার শরীর

গুটিপোকা।

প্রায় এক বুরুল স্থূল ৪।৫
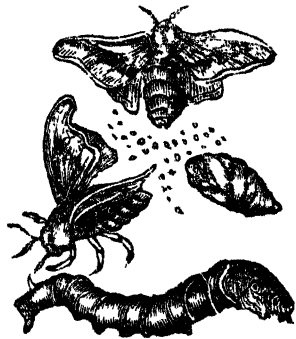
অঙ্গুলি দীর্ঘ হয়। কিন্তু কোন কোন জাতি অনেক ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। উহারা কুল, জীবন, অশ্বত্থ, পলাশ, তুত প্রভৃতি অনেক বৃক্ষে জন্মে ও উহাদিগের পত্র ভক্ষণ করে। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ রেসমই তুতের গুটি দ্বারা উৎপন্ন হয়।

রেসমের উৎপত্তির বিবরণ অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। উক্ত কীটের মাতারা বৃক্ষের পত্রাদিতে যে সকল অণ্ড প্রসব করিয়া রাখে, উপযুক্তরূপ উত্তাপ পাইলেই তাহা ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূওপোকার ন্যায় কীটসকল বহির্গত হয়, পরে উহারা ঐ পত্র সকল ভক্ষণ করত ক্রমশঃ সবল হইয়া বৃক্ষের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। এইরূপে ২৫।৩০ দিন থাকিলেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই ৩।৪ বার আপনাদিগের শরীরের খোলোস ছাড়িয়া থাকে; খোলোস ছাড়িলেই উহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুধামান্দ্য হইয়া আইসে এবং পরিশেষে একেবারে আহারে বিরতি হয়।

এইরূপে ২।৩ দিন অনাহারে থাকিয়া নিকটবর্ত্তী ২।৩টী পাতার মধ্য-গত হইয়া স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রভাবে নাসিকা-রন্ধ্র-দ্বয় হইতে দুই গাছি লাল বাহির করত ঐ পাতায় জড়াইতে থাকে। উক্ত লাল, বাতাস পাইলেই কঠিন সূত্র হইয়া উঠে। ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত অনবরত সূত্র বাহির করিয়া, উহারা আপনাদিগের বাসস্থানটী এমন দৃঢ় করিয়া তুলে যে, তন্মধ্যে জল, বায়ু, তাপ কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না এবং উহা এমন কঠিন হয় যে, পক্ষ্যাদিরা নখ বা চঞ্চুদ্বারা কোন মতেই ভেদ করিতে পারে না। ঐ পদার্থকে গুটি কোষ, বা কোঁয়া বলিয়া থাকে।

কীটেরা ঐ গুটীর মধ্য-গত হইয়া অতি শীঘ্রই এরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তখন উহাদের পূর্ব্বের আকারের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য থাকে না, এমন কি তখন উহারা যে সজীব অবস্থায় আছে, তাহাও সহজে উপলব্ধি হয় না। যাহা হউক, যদি উহাদিগকে অন্য কোনরূপে বিনষ্ট না করাযায়, তাহা হইলে ২০।২৫ দিনের মধ্যেই গুটির অভ্যন্তরস্থ কীটটী বিচিত্র-পক্ষ-সংযুক্ত অপূর্ব্ব প্রজাপতির রূপ ধারণ করত মুখের লাল ও নখের দ্বারা ঐ কোষ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। এই সময়ে উহাদিগের স্ত্রী ও পুরুষজাতি পরস্পর সঙ্গত হইয়া থাকে। ইহার অনতিকাল বিলম্বে ঐ স্ত্রীপতঙ্গটী অনবরত অণ্ড প্রসব করিতে আরম্ভ করে, ঐ অণ্ডগুলিতে একপ্রকার আঠা থাকে, সুতরাং উহারা যাহার উপর পতিত হয়, তাহাতেই একেবারে সংযুক্ত হইয়া যায়। অণ্ডের আকার ক্ষুদ্র মসুরের ন্যায়। দুই এক দিন অণ্ড প্রসব করিলেই প্রজাপতি সকল মরিয়া যায় এবং উহাদের ঐ অণ্ড সকলই ঐ জাতির পুনঃ সৃষ্টির মূল হইয়া থাকে। এইরূপে উক্ত জীবেরা ২।৩ মাসের মধ্যেই জীবনের সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া যায়; কিন্তু ইহার মধ্যেই উহাদিগের অবস্থা—অণ্ড, কীট, গুটি ও প্রজাপতি—সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এই চারি প্রকার হয়।

মুর্শীদাবাদ মাল্দা বীরভূম বর্দ্ধমান ভাগলপুর প্রভৃতি বাঙ্গালাদেশের অনেকস্থানে রেসমের কুঠি আছে। ঐ সকল কুঠির লোকেরা তুতের গুটি দ্বারাই অধিকাংশ রেসম প্রস্তুত করিয়াথাকে। তাহারা আপনাদিগের কুঠির নিকটে তুতবৃক্ষের চাস করে

এবং পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতিদিগকে বস্ত্রাদির উপর ডিম পাড়াইয়া ঐ ডিম গুলিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে। যখন উহাদিগের ফুটিবার উপযুক্ত সময় হয়, তখন বাজ্‌রা বা চালনীতে তুতপাতা বিছাইয়া তদুপরি ডিমগুলি ছড়াইয়া দেয়। অনন্তর উপযুক্তরূপ উত্তাপ পাইলেই ঐ ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয়। যখন পোকাগুলি অতি ক্ষুদ্র থাকে, তখন তাহাদের আহারের নিমিত্ত তুত পাতা সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া তদুপরি ছড়াইয়া দিতে হয়, পোকা বড় হইলে পাতা না কাটিয়া দিলেও হয়, কিন্তু সর্ব্বদাই অতিসাবধানতাপূর্ব্বক বাজ্‌রা ঝাড়িয়া পাতা বদলাইয়া দিতে হয়, নচেৎ উহারা আপনা-দিগেরই মলমূত্রের গন্ধে শীঘ্র মরিয়া যায়। পাতা বদলাইবার সময়ে উহাদের গাত্রে হাত দেয় না, উহারা যে পাত্রে থাকে, তাহার নিকটে অন্য কোন পাত্রে নূতন পাতা রাখিয়া দিলে আপনারাই ঐ পাত্রে গমন করে। কীটদিগকে অধিক পাতা খাও-য়াইলেই অধিক রেসম পাওয়া যায়। যাহা হউক, উহারা ঐ বাজ্‌রাতেই পূর্ব্বোক্তরূপ গুটি বাঁধিলে পর ঐ গুটিগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং চিক্‌না তুলিয়া অধিক দিন রাখিতে হইলে উহাদিগকে উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া থাকে; নচেৎ প্রজাপতি গুটি কাটিয়া ফেলিলে তাহার সমুদায় রেসম নষ্ট হইয়া যায়।

যখন গুটি হইতে চিক্‌ তোলে, তখন উহাদিগকে জলে ফেলিয়া খাই পাইবার নিমিত্ত উহার উপরি-ভাগের কতকটা আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়।

অনন্তর পাশাপাশি স্থিত দুইগাছি থাই বহির্গত হইলে সেইরূপ অনেকগুলি একত্র করিয়া চরকার দ্বারা ঐ চিক্ সকল গুড়াইয়া লইতে হয় এবং তথা হইতে নাটাইয়ে জড়াইয়া কাতা বাঁধিয়া রাখে। কীটের মুখ হইতে যে রেসম নির্গত হয় তাহাতে একপ্রকার আঠা থাকে, কিন্তু জলে ফেলিলেই তাহা ধুইয়া যায়।

কোন কোন রেসম শুক্লবর্ণ হয়, কিন্তু সচরাচর উহা পীতবর্ণ হইয়া থাকে। রেসম অতি কোমল ও স্থিতিস্থাপক। পাট, শণ, প্রভৃতি অন্যান্য সমুদায় দ্রব্যের সূত্র অপেক্ষা রেসম অধিকশক্ত হয়। রেসম এক অপরিচালক পদার্থ, এই নিমিত্ত শীতকালে উহার বস্ত্রাদি গাত্রে দিলে শরীরের তাপ বাহিরে নির্গত হইতে না পারাতে অপেক্ষাকৃত অধিক শীতনিবারণ হয়। রেসমের নির্ম্মিত সাটীন, মকমল, কিঙ্খাপ প্রভৃতি বসন সকল কি অপূর্ব্ব শোভাময়!

ভারতবর্ষ চীন আসাম প্রভৃতি আসিয়াখণ্ডের দেশ সমুদয়ই রেসমের আদিম উৎপত্তি স্থান। অতি প্রাচীন-কাল অবধি রেসমের ব্যবহার এ দেশে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালে রোমকেরা এদেশ হইতে রেসম লইয়া গিয়া স্বদেশে সুবর্ণের মূল্যে বিক্রয় করিত, অনন্তর ইউরোপী-য়েরা পূর্ব্বোক্ত অণ্ড সকল স্বদেশে লইয়া যাওয়াতে তথায় উক্ত কীট জন্মিতে লাগিল; সুতরাং রেসমের মূল্যও ন্যূন হইয়া আসিল।

লাক্ষা।

গালা একপ্রকার প্রাণি-শরীর হইতে উৎপন্ন হয়। শ্যাম, আসাম, ও বাঙ্গালা দেশে অশ্বত্থ, পাকুড়, কুসুম প্রভৃতি কতিপয় বৃক্ষে একপ্রকার কীট জন্মে, উহাদিগের শরীর রক্তবর্ণ ও মৎকুণের ন্যায়। এই কীটের স্ত্রীজাতিই প্রায় সমুদয়, পাঁচ হাজারের মধ্যে এক একটী পুংজাতি থাকে। পুংজাতির আকার স্ত্রীর অপেক্ষা দ্বিগুণ ও তাহার চারিটা পক্ষ।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত কীটের অণ্ডগুলি ফুটিয়া বৃক্ষের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। তখন ইহাদিগের দ্বারা বৃক্ষ এরূপ আচ্ছাদিত হয় যে, দূর হইতে দেখিলে সমুদয় বৃক্ষকেই রক্তবর্ণে রঞ্জিত বোধ হইয়া থাকে। ঐ সময়ে কীটেরা বৃক্ষের রস ও ত্বক্ সকল এরূপে খাইতে আরম্ভ করে যে, তাহাতেই বৃক্ষ মরিয়া যায়। যাহা হউক, অনতি-বিলম্বেই উক্ত কীটেরা স্বশরীরনির্গত আঠার ন্যায় রক্তবর্ণ পদার্থবিশেষের দ্বারা শাখার উপরিভাগে আঁচিলের ন্যায় একপ্রকার বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে আপনারা শয়ান থাকে। তখন তাহাদের জীবন থাকে না, কেবল অভ্যন্তরে রক্তবর্ণ একপ্রকার তরল পদার্থ দৃষ্ট হয়। কিছু কাল পরে উহা হইতে অণ্ড সকল বহির্গত হইয়া যাওয়াতে উক্ত বাসা সকল শূন্য হইয়া অপেক্ষাকৃত রক্তিম-হীন হয়। এই নিমিত্ত লোকেরা অণ্ড বাহির হইবার পূর্ব্বেই শাখা কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দেয়, শুষ্ক হইলে পর শাখা সকল চাঁচিয়া ঐ বাসাগুলিকে একত্র করে, ইহাকেই

লাক্ষা বা লা বলিয়া থাকে। ভারতবর্ষে বৎসরের মধ্যে দুইবার লা ভাঙ্গে—একবার চৈত্রমাসে ও অপর বার আশ্বিনে। অন্যান্য দেশের অপেক্ষা শ্যাম দেশের লাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত লা সকল উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পর তাহাদিগকে অল্প কুটিয়া জলে ধৌত করে, তাহাতে উহার রঙ্‌টা অনেক বাহির হইয়াযায়। অনন্তর উহাদিগকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই জতু বা জৌ প্রস্তুত হয়।

জৌ হইতেই আবার পাতগালা হয়। জৌ সকলকে কাপড়ের থলিয়ার ভিতর রাখিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে ধরিতে হয়। যখন উহা গলিতে আরম্ভ করে, তখন দুই জন লোক থলিয়ার দুই মুখ ধরিয়া পাক দেয়, ইহাতে উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রবীভূত রজন সকল বহির্গত হইয়া নিম্নস্থাপিত বটপত্র বা কদলীকাণ্ডের উপরে পাতলারূপে পড়িয়া জমাট বান্ধিয়া যায়। ইহাকে পাতগালা বলে। পাতগালা দেখিতে সুন্দর ও অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ। অস্মদ্দেশীয় শঙ্খবণিকেরা শঙ্খাদি প্রস্তুত করিতে ইহা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকে। লা বা জতুর বর্ণের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে পাতগালারও বর্ণের তারতম্য হইয়া থাকে।

বাতিগালা, জৌ হইতে একেবারে প্রস্তুত করিলেই অতি উত্তম হয়; কিন্তু পাতগালা হইতে উহা প্রস্তুত করিতে হইলে, ৪ ভাগ পাতগালা ১ ভাগ টার্পিন ও ৩ ভাগ সিন্দূর একত্র মিশ্রিত করে। প্রথমতঃ পাত-গালাকে অঙ্গারের অগ্নিতে লৌহকটাহে গলাইয়া ক্রমে ক্রমে টার্পিন দিতে হয় এবং অনন্তর উপরিভাগে

সিন্দূর দিয়া তাড়ুদ্বারা অনবরত দুই হাতে নাড়িতে হয়। যখন উহারা উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া আইসে, তখন উহার কতকটা লইয়া উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর ফেলিয়া মসৃণ বেলুন দিয়া ডলিলেই বাতিগালা প্রস্তুত হয়। বাতিগালা সীলমোহর ও অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গলাইবার সময়ে উহাতে সিন্দূর না দিয়া যদি অপর কোন রঙ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাতিগালাও সেই রঙের হয়।

লা ধৌত করিয়া লইলে যে রক্তবর্ণ জল অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতেই রঙ প্রস্তুত হয়। অস্মদ্দেশে যে অলক্তক প্রচলিত আছে, তুলার পাতকে ঐ জলে সিক্ত করিয়াই তাহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। আর ঐ রক্তবর্ণ জলকে শুষ্ক করিয়া লইলে যাহা সারভাগ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই রঙের কার্য্যের নিমিত্ত বাট্ বাঁধিয়া রাখে। উহাকেই গালার রঙ বা ইংরাজী নামানুসারে লাক্‌ডাই বলিয়া থাকে। ঐ বাট্‌কে গন্ধদ্রাবক, লবণদ্রাবক প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া বস্ত্রাদিতে রঙ করে। এই রঙ অন্যান্য লোহিত রঙ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়।

অতি প্রাচীনকাল অবধি গালার ব্যবহার ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে; উহা এই স্থান হইতেই ইউরোপে নীত হয়; এক্ষণে উহা তথায় নানাবিধ কার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে।

সর্পবিষ তরল ও ঈষৎপীতবর্ণ। ইহা অতি ভয়ানক পদার্থ। সর্পে একবার দংশন করিলে বিন্দুদ্বয় মাত্র বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু বোধ হয়, তাহাতেই প্রাণিমাত্রেরই প্রাণনাশ হইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ বিষ যতক্ষণ রক্তের সহিত সংযুক্ত না হয়, ততক্ষণ কোন অনিষ্ট হয় না, সুতরাং উহা পান করিলেও জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু জিহ্বা বা কণ্ঠনালীর কোন স্থানে যদি কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষত থাকে, তাহা হইলে বিষ ঐ স্থানে রক্তসংযুক্ত হইয়া প্রাণনাশ করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই কাহারও বিষপানে সাহস হয় না।

সর্প নানাজাতীয় আছে। তন্মধ্যে কয়েক জাতিমাত্র বিষধর। ঐ বিষ উহাদিগের মুখের কোন স্থানে থাকে, এবং কিরূপে উহা দষ্ট ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হয়, এবিষয়ে লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে, অতএব এস্থলে তাহার বিবরণ লেখা যাইতেছে। বিষধর সর্পদিগের মুখের উপরের মাড়িতে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ যে দুইটী দন্ত থাকে, তাহাই বিষদন্ত। ঐ দন্তের আকার সূচীর ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম; উহার অগ্রভাগ নিরেট, কিন্তু অপরাংশে অতি সূক্ষ্ম একটী ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের উপরিভাগে মাড়ির অভ্যন্তরে বিষকোষ। সর্প যখন শান্তমূর্ত্তি থাকে তখন ঐ দন্তদ্বয় তালুরদিকে অবনত থাকে, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেই উহারা উন্নত হইয়া উঠে। সর্প যখন কোন শরীরে দংশন
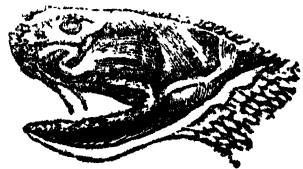
সর্পমুখ।

করে তখন উক্ত দন্তস্থ ছিদ্রের বহির্ভাগে যে দ্বার থাকে সেই দ্বার দিয়া ঐ ছিদ্র সহকারে বিষকোষ হইতে বিষ আসিয়া ঐ ক্ষতভাগে বেগে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই উহা রক্তসংযুক্ত হইয়া অনিষ্টকর হয়।

সর্পের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে তাহা হইতে আর বিষ নির্গত হইতে পারে না। কিন্তু উহার নিকটে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত থাকে, তাহারাই আবার ৫।৬ দিনে বৃহৎ হইয়া বিষদন্তের কার্য্য করিয়াথাকে। সর্পবিষ প্রাণি-মাত্রেরই অতিশয় অনিষ্টকর বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসক মহাশয়েরা ইহাদ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির আরোগ্যলাভের জন্য অদ্যাপি কোন উত্তম ঔষধ প্রকাশিত হয় নাই। উহার সর্ব্ববাদি-সম্মত এইমাত্র উপায় যে, যে স্থান সর্প-দষ্ট হইবে, যদি অবিলম্বে তাহার উপরিভাগ উত্তমরূপে বাঁধিয়া ক্ষতভাগ চিরিয়া দিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বিষ আর কোন প্রকারেই অনিষ্টকর হইতে পারে না।

মুক্তা।

মুক্তা গোল, উজ্জ্বল ও প্রায়-স্বচ্ছ পদার্থ। সংস্কৃত কবিরা এই বস্তুর অতিশয় গৌরব করিতেন। তাঁহারা যে কত স্থানেই মুক্তাকলাপের বর্ণন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাস্তবিকও স্থূল মুক্তাফল ও তদ্দ্বারা রচিত মালা দেখিতে অতি রমণীয় বস্তু।

অনেকের বোধ আছে যে, গজ বরাহ শুক্তি প্রভৃতি অনেক জীবের শরীরে মুক্তা জন্মে এবং তন্মধ্যে গজমুক্তাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে, শুক্তি ও তজ্জাতীয় অপর ২।৩ প্রকার জলচর জন্তু ভিন্ন অন্য কোন জীবের মুক্তা কখন দৃষ্টি-গোচর হয় নাই; শুক্তিদিগের শরীরের আবরণ স্বরূপ যে কঠিন খোলা থাকে, সেই খোলার মধ্যেই মুক্তা সকল জন্মে, কিন্তু উহারা যে, শুক্তিদিগের কোন উপকারের নিমিত্ত জন্মে বা রোগবিশেষে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে অদ্যাপি স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে অনেকে দ্বিতীয় পক্ষই অবলম্বন করেন। তাঁহারা কহেন যে, যেস্থানে অনেক শুক্তি থাকে, সেই স্থানে একপ্রকার কীট জন্মিয়া উহাদিগের গাত্রে ছিদ্র করিতে আরম্ভ করে। ছিদ্র করিলেই শুক্তিরা আপন শরীর হইতে রস বাহির করিয়া ঐ ছিদ্র রোধ করিবার চেষ্টা করে এবং সেই রস গাঢ় ও কঠিন হইলেই মুক্তা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের সমুদায় উপকূলভাগ এবং পারস্য উপসাগরের অর্ম্মস্ প্রণালীতে অনেক শুক্তি পাওয়া যায়। ডুবুরিরা থলিয়ার সহিত ঐ সকল সমুদ্রের তলভাগে নিমগ্ন হইয়া শুক্তি সকল তুলিয়া আনে এবং উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া তন্মধ্য হইতে যে সকল মুক্তা পাওয়া যায়, তাহা বাহির করিয়া লয়। আমাদিগের দেশে যে সকল শুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সামুদ্রিক শুক্তি অবিকল সেইরূপ নহে।

অস্মদ্দেশীয় কামিনীগণ মুক্তাসংযুক্ত অলঙ্কার সকল অতি সমাদরপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে

মুক্তাময় হারই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও বহুমূল্য। মুক্তার মূল্য অধিক দেখিয়া ইউরোপীয় মহাশয়েরা একপ্রকার কৃত্রিমমুক্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাও নূতনবেলা প্রকৃতমুক্তার ন্যায় চাকচক্য বিশিষ্ট থাকে, কিন্তু ব্যবহৃত হইলে শীঘ্র মলিন হইয়া যায়। কৃত্রিমমুক্তা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, ভারের অল্পতাবশতঃ অবশ্যই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কৃত্রিমমুক্তা প্রস্তুত করিতে হইলে কাচ-নির্ম্মিত সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তবলকীকে এমোনিয়া নামক আরকে দ্রবীকৃত একপ্রকার মৎস্যের আঁইসে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। উহাতে উক্ত আঁইস সকল ছিদ্র দিয়া ঐ তবলকীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ঐ আঁইসে কিঞ্চিৎ সিরীস মিশ্রিত থাকাতে উহা অভ্যন্তরেই লাগিয়া থাকে। অনন্তর ঐ আরক শুষ্ক হইয়া যাইলে তবলকী সকল অভ্যন্তরস্থ শল্কসংযোগ বশতঃ উজ্জ্বল ও অতিশয় লাবণ্যময় হইয়া প্রকৃত মুক্তার ন্যায় হয়।

সিরীস।

সিরীস দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। শুষ্ক থাকিলে ইহাতে কিছুমাত্র আঠা অনুভূত হয়। কিন্তু জল দিয়া অগ্নিতে দ্রবীকৃত করিলে উহার এমত আঠা হয় যে, তদ্দ্বারা কাষ্ঠাদিও যোড়া দেওয়া যায়।

চর্ম্ম, নখ, কেশ, শৃঙ্গ প্রভৃতি দগ্ধ করিলে যেরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়, সিরীস পোড়াইলেও সেইরূপ হয়। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকল হইতেই

সিরীস উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিরীস প্রস্তুত করিতে হইলে পশুদিগের চর্ম্ম ও খুর শৃঙ্গাদি-যুক্ত অকর্ম্মণ্য মাংস সকল ২।৩ দিন কিঞ্চিৎ চূর্ণমিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখে; অনন্তর উহাদিগকে কুটিয়া লৌহ কটাহে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকে। সিদ্ধ করিতে করিতে উহার কতকভাগ গলিয়া ঘন আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ হইয়া উঠে। অনন্তর উহাকে সচ্ছিদ্র বাজরার উপর রাখিলে আঠাসকল, ঐ ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া পড়ে। পরে ঐ আঠাকে পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ ফুটাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া বাতাসে শুষ্ক করিতে দিলেই উহা জমিয়া সিরীস হয়।

সিরীসের আঠার যেরূপ শক্তি, সেরূপ প্রায় অন্য কোন আঠারই নাই, এই নিমিত্ত সূত্রধরেরা সিরীসের দ্বারাই কাষ্ঠাদি যুড়িয়া থাকে। অন্যান্য শিল্পকরেরাও আঠার স্থলে সিরীসই সচরাচর ব্যবহার করে। দ্রবীকৃত সিরীস মোটা কাগজের এক পৃষ্ঠে লাগাইয়া তাহাতে বোতলচূর্ণ প্রদান করত শুষ্ক করিয়া সিরীসকাগজ করে। সিরীসকাগজদ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত সমুদায় দ্রব্যই উত্তমরূপে পালিষ হইয়াথাকে।

শৃঙ্গ—দন্ত—অস্থি।

অনেক জীবের শৃঙ্গ, দন্ত ও অস্থি আমাদিগের অনেক কার্য্যোপযোগী হয়। শৃঙ্গের আকার যেরূপ তাহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু ঐ শৃঙ্গ হইতে নানাবিধ আকারের দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়াথাকে। মেষ মহিষ প্রভৃতির শৃঙ্গসকলকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত জলে

সিদ্ধ করিলে উহারা যে আঠাযুক্ত ও কোমল হয় তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইল। উহাদিগকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে প্রথমতঃ শৃঙ্গ সকলকে উত্তম করপত্রদ্বারা লম্বালম্বি চিরিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হয়, এবং পরে কিঞ্চিৎ কোমল হইলে পাতের মত করিয়া জাঁত দিয়া থাকে। অনন্তর উহাদিগকে মসৃণ ও পাতলা করত তদ্দ্বারা লণ্ঠন, নস্যাধার, পেয়ালা, ছুরির বাঁট, ছাতির হাতল প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে।

শৃঙ্গদ্বারা খড়মের বগুলা চিরুণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে হইলে ঐরূপ প্রক্রিয়া করিবার প্রায় আবশ্যকতা হয় না। শৃঙ্গকে কুঁদিয়া লইলেই বগুলা হয়। শৃঙ্গমাত্রেই প্রায় ফাঁপা, সুতরাং উহার এক দিকে করাত করিয়া অগ্নির উত্তাপ দিয়া অনায়াসে পাত করা যায় এবং সেই পাতকে উখাদ্বারা ঘষিয়া চিরুণী প্রস্তুত করিয়া থাকে। শৃঙ্গ-নির্ম্মিত দ্রব্য সকল প্রায়ই ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হয়।

শৃঙ্গদ্বারা যে যে দ্রব্য হয়, হস্তিদন্তদ্বারাও প্রায় সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াথাকে। হস্তিদন্ত মসৃণ, উজ্জ্বল ও শুভ্রবর্ণ। শৃঙ্গকে অগ্নিসংযোগে যেরূপ কোমল করা যায়, হস্তিদন্তেরও পাতলা খণ্ড সকলকে সেইরূপ করিয়া ছুরির বাঁট, স্লাইস্ ও পূর্ব্বোক্ত সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মুর্শিদাবাদ রাজসাহী প্রভৃতি প্রদেশস্থ শিল্পকরেরা হস্তিদন্তের দ্বারা পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতির মনোহর প্রতিরূপ এবং সতরঞ্চের বল, চক, লাঠিম প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়নক বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করে।

হস্তিদন্তের গুঁড়া সকল মুচি করিয়া পোড়াইলে এক প্রকার উত্তম কাল রঙ প্রস্তুত হয়। উক্ত রঙ চিত্রকরেরা নানা কার্য্যে ব্যবহার করিয়াথাকে।

হস্তিদন্ত রক্ত, পীত, হরিত প্রভৃতি নানা রঙ্গে রঞ্জিত হয়, কিন্তু উহার স্বাভাবিক শুভ্রতা যেরূপ মনোহর, তেমন আর কিছুই নহে। আফ্রিকার গিনি উপকূলে অনেক হস্তী জন্মে, সুতরাং তথা হইতে অনেক হস্তিদন্ত আনীত হয়। হস্তিদন্ত কখন কখন ৫ | ৬ হস্ত লম্বা হইয়া থাকে।

গণ্ডারের খড়্গা, কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি ও সিন্ধুঘোটকের দন্তেও পূর্ব্বোক্তরূপ অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। গ্রীন্‌লণ্ডের নিকট যে সকল তিমি মৎস্য পাওয়া যায়, তাহাদিগের মুখের অভ্যন্তরের অস্থিদ্বারা চাবুক, ছাতার সিক প্রভৃতি নানা দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ঐ সকল সিককে কাঁচকড়া বলিয়া থাকে, কাঁচকড়া বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপক।

ঊর্ণা।

মেষ ছাগ প্রভৃতি পশুর লোমকে ঊর্ণা বা পশোম কহে। ঊর্ণা দুশ্ছেদ্য ও স্থিতিস্থাপক। ইহার অপরিচালকতা গুণই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। এই গুণ থাকাতে ঊর্ণা-নির্ম্মিত বস্ত্র সকল অধিকপরিমাণে শীতনিবারণ করে।

পৃথিবীর উত্তর ভাগে অতিশয় শীত, সুতরাং সে দেশে ঊর্ণাবস্ত্র অতিশয় আবশ্যক এবং জগদীশ্বরের কৃপায় তথায় ঊর্ণাও অধিক জন্মিয়া থাকে। ঐ সকল

দেশের মেষাদি যেরূপ বৃহৎ ও ঘনতর-লোমাবৃত হয়, অস্মদ্দেশে কখনই সেরূপ হয় না। যাহা হউক, মেষ সকল উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলে, তাহাদিগের যেরূপ উৎকৃষ্ট ঊর্ণা জন্মে, বনচর মেষদিগের সেরূপ জন্মে না।

এক মেষেরই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লোম জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে স্কন্ধ দেশের লোমই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কোন কোন মেষের লোম প্রায় অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম কাল আরম্ভ হইলে মেষদিগের শরীর হইতে লোম কাটিয়া লয় এবং সেই লোমগুলি উত্তমরূপে বাছিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দেয়। অনন্তর উহাদিগকে জলে ধৌত ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লৌহচিরণীর দ্বারা আঁচ্ড়াইয়া থাকে। আঁচড়ান সমাপন হইলে উহাদিগকে তৈলদ্বারা ঈষৎ চিক্কণ ও কোমল করত চরকার দ্বারা সূত্র করিতে আরম্ভ করে।

ঐ সূত্র সকল দুইপ্রকার হয়, একপ্রকারে পাক অধিক প্রদত্ত হয় ও অপরপ্রকারে অল্প। বস্ত্র ও বনাতাদির বয়ন করিবার সময়ে প্রথম প্রকার সূত্রের তানা ও দ্বিতীয় প্রকারের পড়িয়ান দিয়া থাকে। এইরূপে বস্ত্র প্রস্তুত হইলে পর উহাদিগকে জলে ফেলিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। ধৌত করাতে উহার মল সকল বাহির হইয়া যায় এবং জল লাগাতে বস্ত্র সকল পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন হইয়া উঠে। অনন্তর উহাদিগকে ব্রুষ দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করত বিক্রয় করিয়া থাকে।

বনাত, কার্পেট, কম্বল, ফ্লানেল প্রভৃতি বস্ত্র সমুদায় ঊর্ণা হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াতে ঊর্ণার স্বাভাবিক যে বর্ণ, তন্নির্ম্মিতকম্বলাদিও সেই বর্ণের হয়। কিন্তু ঐ সকল যদি রঞ্জিত করিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে প্রস্তুত বনাতেই একেবারে রঙ করে, অথবা সূত্র কাটিবার পূর্ব্বে ঊর্ণাতেই রঙ করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের হিমালয়প্রদেশে অতিশয় শীত, এ নিমিত্ত ঐ স্থানে উত্তম ঊর্ণাও জন্মিয়া থাকে। নেপালের কম্বল অতি প্রাচীনকাল অবধি অস্মদ্দেশে অতিশয় প্রসিদ্ধ আছে। হিমালয়ের উত্তর তিব্বত দেশে একপ্রকার ছাগ জন্মে, তাহাদিগের লোমের গোড়া হইতে যে অপর একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম উঠে, তদ্দ্বারা শাল হয়। ঐ সকল শাল কাশ্মীরদেশে প্রস্তুত হয় বলিয়া উহাদিগকে কাশ্মীরী শাল কহে। শাল এতদ্দেশে এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ।

এক্ষণে ঊর্ণা ও তন্নির্ম্মিত নানাবিধ বস্ত্রাদি ইংলণ্ড দেশের এক প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে।

মধূথ বৰ্ত্তিকা।

আমরা সচরাচর যাহাকে মধূথ-বর্ত্তিকা বা মমবাতি বলিয়া থাকি, তাহা মমে যেমন প্রস্তুত হয়, তিমি মৎস্যের তৈল ও পশ্বাদির বসাতেও সেইরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মম যে কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে অনেক মতামত আছে, কিন্তু এক্ষণকার নূতন মত এই যে,

মক্ষিকাদিগের বস্তি-দেশের মধ্যভাগে এক পৃথক্ ইন্দ্রিয় আছে, তদ্দ্বারা ঐ পদার্থ নির্গত হয় এবং তাহাতেই উহাদের বাসস্থানরূপ মধুক্রম নির্ম্মিত হইয়াথাকে।

মধুক্রম হইতে সকল মধু বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা রৌদ্রে গলাইলেই মম প্রস্তুত হয়।

এই প্রকার মম কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ হয়। কিন্তু উক্ত চাক সকল ফুটন্ত জলে গলাইলে পর যে মম হয়, তাহা অতি শুভ্রবর্ণ। মমদ্বারা বাতি প্রস্তুত করিতে হইলে তরল মমকে সীসের ছাঁচে ঢালিতে হয়। ঐ ছাঁচের মধ্যে শণ বা তূলার বর্ত্তিকা পূর্ব্বেই প্রদত্ত থাকে। সুতরাং শীতল হইয়া বাতি হইলে পর উক্ত বর্ত্তিকা তাহার মধ্যভাগেই থাকিয়া যায়। অনন্তর উহাকে বাহির করিয়া ঐ বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিলে নিম্নস্থ দ্রবীভূত মম উহার আঁশে আঁশে ঊর্দ্ধভাগে উঠিয়া জ্বলিতে থাকে। মমবাতির আলোক শুভ্রবর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর।

তিমিতৈল ও বসাকেও ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত করিয়া উক্তরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা বাতি প্রস্তুত করে। বসা শরীরের অন্তর্গত তৈলময় একপ্রকার পদার্থ। উহা চর্ম্মের নীচেই থাকে। পশ্বাদির বসা অনেক প্রয়োজনে লাগে। বসা পৃথক্ করিতে হইলে বসাযুক্ত চর্ম্মকে জলে সিদ্ধ করিতে হয়, সিদ্ধ করিতে করিতে জলের উপরিভাগে তৈলবৎ যে একপ্রকার পদার্থ ভাসিয়া উঠে তাহাকেই জল হইতে তুলিয়া বাতাসে শীতল করিলে পর জমিয়া বসা প্রস্তুত হয়।

চীন দেশে বসা-বৃক্ষ নামে একপ্রকার বৃক্ষ আছে। তাহার ফলে তৈলবৎ একপ্রকার পদার্থ জন্মে। উহা প্রদীপে জ্বলে এবং উহাদ্বারা অতি শুভ্রবর্ণ বাতি প্রস্তুত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

খনিজ—ধাতু।

খনি অর্থাৎ আকর হইতে যে সকল বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে খনিজ বলাযায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, অভ্র, লবণ, হরিতাল প্রভৃতি এই সকল বস্তু খনিহইতে উৎপন্ন হয়। অতএব উহাদের সকলেরই সাধারণ নাম খনিজ হইতে পারে। তন্মধ্যে স্বর্ণাদির 'ধাতু' এই একটী বিশেষ নাম আছে, এই নিমিত্ত উহারা ঐ শব্দদ্বারাই সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকে। গন্ধকাদির অপর কোন বিশেষ নাম নাই, সুতরাং সামান্যতঃ উহাদিগকে খনিজ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এ গ্রন্থে কোন কোন পার্থিব পদার্থকেও খনিজশ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভূত করাযাইবে।

ধাতুর বিশেষ গুণ এই যে, ইহা অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা অধিকভারী। ধাতুসকল নিতান্ত ভঙ্গ-প্রবণ নহে। ইহাদিগকে অগ্নিতে দ্রব করিতে পারা যায়, এবং পিটিয়া পাতলা পাত বা সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়। ধাতু অতিশয় ভারসহ, এই নিমিত্ত ধাতুর অতি সূক্ষ্ম তারে কোন গুরু-ভার বস্তু ঝুলাইলেও সহসা ছিঁড়িয়া যায়না।

আকরে যে সকল ধাতু পাওয়াযায়, তাহা দুই প্রকার, বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র। যে সকল ধাতুর সহিত অন্য কোন দ্রব্যের যোগ না থাকে, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ, আর যোগ থাকিলে তাহাদিগকে বিমিশ্র ধাতু বলা-গিয়াথাকে।

ধাতুর ন্যায় অন্য খনিজদিগের কোন সাধারণ বিশেষ গুণ নাই, কিন্তু উহারাও আকর হইতে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুইপ্রকারই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ধাতু ও খনিজ সকল অনেকপ্রকার; তন্মধ্যে এ স্থলে প্রধান প্রধান কতকগুলির মাত্র বিবরণ করা যাইবে।

স্বর্ণ।

স্বর্ণ পীতবর্ণ, উজ্জ্বল ও দেখিতে অতি সুশ্রী। স্বর্ণ জল অপেক্ষা ১৯৷৷০ গুণ ভারী। অর্থাৎ যে পাত্রে /১ সের জল ধরে, সেই পাত্রে স্বর্ণ গলাইয়া ঢালিলে ।৯৷৷০ সাড়ে উনিশ সের ধরিতে পারে। স্বর্ণ এরূপ ঘাতসহ যে, একসরিষাপ্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া দীর্ঘে ও প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এবং ঐ প্রমাণ স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ভারসহও এরূপ যে, এক যবোদর মাত্র স্থূল তারে ৫ মণ ৮৪ চৌত্রিশ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাতু। ইহাকে গলাইলে ভার কমিয়া যায় না ও বর্ণের ব্যত্যয় হয় না। বিশুদ্ধ স্বর্ণকে অনায়াসে নোয়াইতে পারা যায়, এই নিমিত্ত মোহর

বা অন্যান্য অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইলে রৌপ্য বা তাম্র মিশ্রিত করিয়া স্বর্ণকে কঠিন করিতে হয়। খাটি সোণায় কোন সূক্ষ্ম অলঙ্কারই নির্ম্মিত হইতে পারে না। তাম্র-মিশ্রিত স্বর্ণ যেরূপ উজ্জ্বল হয়, রৌপ্য-মিশ্রিত সেরূপ হয় না।

স্বর্ণপাত প্রস্তুত করিতে হইলে স্বর্ণকে মার্ব্বেল প্রস্তরের অতিমসৃণ পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া হাতুড়ির দ্বারা অনবরত পিটিতে হয়। পিটিবার সময়ে উহাকে প্রথমে অতিমসৃণ চর্ম্মের দ্বারা মুড়িতে হয়। পরে কিঞ্চিৎ পাতলা হইলে ঐ চর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিয়া এবং নাড়ী-নির্ম্মিত সূক্ষ্মতর অপর চর্ম্মদ্বারা মুড়িয়া সমুদায়টা মেষচর্ম্মে আচ্ছাদিত করিতে হয়। এরূপ না করিলে হাতুড়ির আঘাতে উহা নষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর ঐ স্বর্ণ পিটিতে পিটিতে উপযুক্তরূপ পাতলা হইয়া আসিলে তাহাকে কাগজের উপর রাখিয়া তদুপরি অপর একটা কাগজ চাপা দিয়া রাখে। রেশম বা রূপার তারে ঐরূপ পাতলাসোণা মুড়িয়া দিলেই সোণার তার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রূপা, তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুপাত্রের এবং কাষ্ঠ পুস্তকাদির উপরিভাগমাত্র স্বর্ণদ্বারা আচ্ছাদন করাকে গিল্ট করা কহে। উক্ত গিল্ট অনেক প্রকার, তন্মধ্যে একপ্রকার গিল্ট উক্তরূপ পাতদ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে দ্রব্য গিল্টকরিতে হইবে, তাহাতে পারা মাখাইয়া তদুপরি স্বর্ণপাত বসাইয়া দিতে হয়। এইরূপ দুই তিন বার করিয়া উক্ত পাত্র অগ্নিতে ধরিলেই পারা উড়িয়া যায়। অনন্তর ঐ পাত্রকে রসান প্রস্তরদ্বারা পালিষ করিলেই উত্তম স্বর্ণ পাত্রের ন্যায় দেখায়।

ব্রেজিল, পেরু, মেক্সিকো প্রভৃতি অনেক দেশে স্বর্ণের আকর আছে। ভারতবর্ষ আমেরিকা ও আফ্রিকার কোন কোন নদীতে বালুকার আকারে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়াযায়। পূর্ব্বে পেরু, লিমা ও জর্ম্মানদেশে অনেক স্বর্ণ পাওয়াযাইত। এক্ষণে কালিফর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়াতে অনেক স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে। এই দুই স্থানের স্বর্ণদ্বারাই এক্ষণে স্বর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের হিমালয় পর্ব্বত প্রভৃতি অনেক স্থানে স্বর্ণ পাওয়া গিয়া থাকে। কোন কোন পর্ব্বতের শিলাতে রেখাবৎ স্বর্ণের অংশ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কোথাও বা প্রস্তরের মধ্যে নানা দ্রব্য-মিশ্রিত চাপ চাপ সুবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই বিমিশ্র-সুবর্ণ কহা গিয়াথাকে।

বিমিশ্র স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমতঃ সমুদয়কে চূর্ণ করিয়া পারদের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। পারদও রাসায়নিক সংযোগ সহকারে শ্যামিকা (খাইদ) সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্বর্ণের সহিতই মিশ্রিত হয়। অনন্তর উহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলেই পারদ উড়িয়া যায় এবং বিশুদ্ধস্বর্ণ অবশিষ্ট থাকে।

গন্ধক।

গন্ধক একপ্রকার খনিজ পদার্থ। ইহা পীতবর্ণ, কঠিন এবং ভঙ্গ-প্রবণ। অল্পমাত্র তাপ লাগিলেই গন্ধক গলিয়া এবং উড়িয়া যায়। অগ্নিতে পুড়িবার সময়ে ইহার নীলবর্ণ শিখাসকল বহির্গত হয়। নেপাল, পারস্য, জাভা প্রভৃতি নানা দেশে গন্ধকের আকর

আছে। আকর হইতে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার গন্ধকই পাওয়াগিয়াথাকে; কিন্তু আগ্নেয় পর্ব্বতের নিকটস্থ স্থান সকলে কেবল বিদ্ধশু গন্ধকই দৃষ্ট হয়। ইহাতে সকলে অনুমান করেন, যে অগ্নির উত্তাপ লাগাতে তৎস্থানের গন্ধকসকল বিশুদ্ধ হইয়া যায়। বিমিশ্র গন্ধকে সীস, দস্তা, তাম্র, পারদ, লৌহ, হরিতাল প্রভৃতি অনেক বস্তুর যোগ থাকে। উক্ত বিমিশ্র গন্ধককে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

বিশুদ্ধ করতে হইলে অগ্নি-সংযোগদ্বারা গন্ধককে ধূমময় করিয়া সেই ধূম কোন ইষ্টকের গৃহমধ্যে প্রবেশিত করাইতে হয়, এবং ঐ গৃহের উপরিভাগে ছিদ্রাদি করিয়া এরূপ কৌশল করিতে হয় যে, তদ্দ্বারা গৃহস্থিত উষ্ণ বায়ু সকল নির্গত হইয়াযায়, অথচ বাহ্য বায়ু প্রবেশ করিতে না পায়। এরূপ প্রক্রিয়া করিলেই গৃহমধ্যে উক্ত ধূম সকল জমিয়া বিশুদ্ধ গন্ধকের আকারে পরিণত হয়।

গন্ধক, জল বা অন্যকোন তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় না। কেবল উষ্ণ গর্জ্জন তৈল ও টার্পিণ তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়।

গন্ধক অনেক ঔষধে লাগে। উহার নির্ম্মিত দীপ-শলাকা সকল সাংসারিক দ্রব্যের মধ্যে এক অতিশয় উপকারক। গন্ধকের ধূম অতিশয় দুর্গন্ধ ও অপকারক। উহার আর একটী চমৎকার গুণ আছে এই যে, উহা লাগিলে পুষ্পাদির রক্ত বর্ণ শ্বেত হইয়া যায়।

গন্ধকে যে দ্রাবক প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় উগ্র ও অম্ল। উহার এমন তেজঃ যে, বস্ত্রাদিতে লাগিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া যায়। উক্ত দ্রাবকের বিলক্ষণ

জারকতা শক্তি আছে; এ নিমিত্ত উদরাময় প্লীহা প্রভৃতি রোগযুক্ত ব্যক্তিরা রম্ভাদির অভ্যন্তরস্থ করিয়া উহা খাইয়া থাকে।

উক্ত দ্রাবক ও তাম্র একত্র করিয়া লৌহ কটাহে স্থাপনপূর্ব্বক জ্বাল দিলেই তুঁতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তুঁতে তাম্রের আকর হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় যে, আকরমধ্যেই উক্ত উভয় দ্রব্যের নির্দ্দিষ্টভাগপরিমাণে অবশ্যই সংযোগ হইয়া থাকিবে। তুঁতে নীলবর্ণ তিক্ত ও অতি বিস্বাদ। ইহা খাইলে অত্যন্ত বমন হয়। ইহাদ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। দ্রাবকের সহিত তাম্র মিশ্রিত করিলে যেরূপ তুঁতে হয়, সেইরূপ উহাতে লৌহ মিশ্রিত করিলে হীরাকস্ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রৌপ্য।

রৌপ্য শুভ্রবর্ণ, উজ্জ্বল ও কঠিন। জল অপেক্ষা প্রায় ১১ গুণ ভারী। স্বর্ণের যেরূপ সূক্ষ্মতার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হয় রৌপ্যেরও প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে। রৌপ্যও সামান্য ভারসহ নহে। রৌপ্যের এক যবোদরমাত্র স্থূলতারে ৪ মণ ১১ এগার সের পর্য্যন্ত ভার ঝুলিতে পারে।

বিশুদ্ধ রৌপ্যকে কিঞ্চিৎ নোয়াইতে পারা যায়, এজন্য মুদ্রা বা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে হইলে রৌপ্যকে তাম্রমিশ্রিত করিয়া কঠিন করিয়া লয়।

রৌপ্য কেবল যবক্ষারদ্রাবকে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

ঐ দ্রব্য কোন পাত্রে কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া থাকিলে দানা জন্মিয়া থাকে। উক্ত দানা সকল মুচির উপর একত্র করিয়া গলাইলে কাষ্টকি উৎপন্ন হয়। কাষ্টকি ডাক্তরদিগের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। বহু দিনের ক্ষতস্থানের উপর কাষ্টকি ঘসিয়া দিলে উহার পচা মাংস সকল দগ্ধ হইয়াযায়। তদ্ভিন্ন আঁচিল, আব প্রভৃতি অপরাপর মাংসপিণ্ডেও কাষ্টকি ঘসিয়া দিলে সমুদায় পুড়িয়া আরাম হইয়া যায়।

পৃথিবীর অনেক স্থলেই রৌপ্যের খনি আছে। তন্মধ্যে মেক্‌সিকো ও পেরু দেশের আকর হইতে যত রৌপ্য উৎপন্ন হয়, এত আর কুত্রাপি হয় না। উক্ত পেরুদেশের খনি হইতে এমত এক বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয় যে, তদ্দেশীয় বহুসংখ্যক লোকে উহার ঘ্রাণে খনিমধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। স্যাক্‌সনি প্রদেশের ফ্রাইবর্গ নামক স্থানে একবার একটা বৃহদাকার রৌপ্যপিণ্ড পাওয়াগিয়াছিল। ঐ পিণ্ড গলাইলে পর উহা হইতে প্রায় ৫০০ মণ বিশুদ্ধ রৌপ্য বহির্গত হয়।

আকর হইতে যে সকল বিমিশ্র রৌপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে বিশুদ্ধ করিবার, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রথা আছে। তন্মধ্যে একপ্রকার এই যে, উক্তরূপ রৌপ্যকে প্রথমতঃ চূর্ণ করিয়া ঈষদুত্তপ্ত জল দিয়া ক্ষালন করিতে হয়। অনন্তর উহাতে পারদ মিশ্রিত করিয়া জলপূর্ণ পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক অনবরত সঞ্চালন করিতে হয়। এইরূপ করিতে করিতে রৌপ্য খাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া পারার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। পরে উহাকে তুলিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাই-

লেই পারা উড়িয়া গিয়া বিশুদ্ধ রৌপ্য অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহাতেই রৌপ্যের বাট্ প্রস্তুত হয়।

মৃদঙ্গার।

মৃদঙ্গার (পাথুরিয়া কয়েলা) কৃষ্ণবর্ণ, উজ্জ্বল ও অতিশয় দাহ্য পদার্থ। ইহা খনিহইতে উৎপন্ন হয়, অতএব ইহাও খনিজ পদার্থ-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এক্ষণে অনেকে অনেকরূপ পরীক্ষা করিয়া মৃদঙ্গারকে উদ্ভিজ্জে-রই পরিণামবিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, পৃথিবীর উপরিভাগের আকার প্রকার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে—এক্ষণে যে সকল স্থান অতিশয় নিম্ন বা উন্নত আছে, কালক্রমে তাহারাই পর্ব্বত-পৃষ্ঠ বা সমুদ্র-গর্ত্ত হইতে পারে। যাহাহউক তাঁহাদিগের মীমাংসানু-সারে এই স্থির হইয়াছে যে, কোন কালে যে সকল উদ্ভিজ্জ ভূমিসাৎ হইয়া মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইয়া গিয়া-ছিল, কালক্রমে তাহারাই পচিয়া ও মাটির চাপে জমাট হইয়া উক্তরূপ মৃদঙ্গারের আকার ধারণ করিয়াছে।

মৃদঙ্গারের আকর অনেক দশেই আছে। কতি-পয় বৎসর অতীত হইল, অস্মদ্দেশে রাণীগঞ্জ ও উহার সন্নিহিত কয়েকস্থানে কয়লার কয়েকটী আকর প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত আকরসকল দেখিতে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। উহার উপরিভাগে গ্রাম নগর পর্ব্বতাদি সমুদয়াই অবস্থিত থাকে। লোকেরা কোন এক স্থানে গভীর গহ্বর করিয়া অভ্য-ন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তথা হইতে কয়লা সকল কাটিয়া

বাহির করিয়া লয়। কাটিবার সময়ে উপরিভাগে একটি ছাদ রাখিয়া যায়; ঐ ছাদ পতিত না হয়, এজন্য মধ্যে মধ্যে কয়লারই এক এক স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং ক্রমে ক্রমে নিম্নভাগে নামিবার জন্য এক সিঁড়িও রচিত হইয়া থাকে। উক্ত আকর সকলের বিস্তার সকল স্থানে সমান নহে; কিন্তু সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ যত নিম্ন থাকে, গভীরতা প্রায় কুত্রাপি তদপেক্ষা ন্যূন হয় না।

কয়লার আকরে প্রবেশ বা কর্ম্ম করা অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কারণ উহার উপরিভাগে ছাদ থাকাতে আলোক কিঞ্চিমাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং উহাতে প্রবেশ করিতে হইলেই প্রদীপ লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু অভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে এরূপ এক বাষ্প উদ্গত হয় যে, তাহা অনলসংযুক্ত হইবামাত্র জ্বলিয়া আকর-চারী সমুদয় লোককে দগ্ধ করিয়া ফেলে। সর্ হম্ফরি ডেবিসাহেব এই উৎপাত নিবারণের জন্য লৌহময় তারের জালদ্বারা একপ্রকার লণ্ঠন প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ লণ্ঠনকে "সেফ্টি ল্যাম্প" কহে। উহার মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত বাষ্প সকল একেবারে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে না পারাতে এবং বাহিরের বাষ্পের সহিত অগ্নি সংযোগ না হওয়াতে উক্ত আশঙ্কা দূরীকৃত হয়।

আকরে অপররূপ বিঘ্নও ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কখন কখন নিম্নদেশ হইতে জল উঠিয়া সমুদয় ডুবাইয়া দেয় এবং কখন বা এরূপ এক বাষ্প উদ্গত হয় যে, তাহাতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া লোকের প্রাণবিয়োগ হয়।

কয়লা সকল আকরেই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্বালানি কাষ্ঠের সকল কার্য্যই কয়লাদ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, কয়লা না থাকিলে বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার হইত। কলিকাতায় যে গ্যাসের আলোক প্রদত্ত হয়, উক্ত গ্যাস কয়লা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পারদ।

পারদ শুক্লবর্ণ, উজ্জ্বল ও তরল পদার্থ। জল অপেক্ষা প্রায় সাড়ে তের গুণ ভারী। তরল পদার্থের মধ্যে ইহার ন্যায় গুরু বস্তু আর কিছুই নাই। পারদ সর্ব্বদাই তরল থাকে; কিন্তু অত্যন্ত শীতল হইলে জমিয়া কঠিন হইয়া উঠে, সুতরাং মেরু-সন্নিহিত দেশ পারদকে কখনই তরল দেখা যায় না। জমিলে ইহাকে পিটিয়া পাত বা তার সকলই করা যাইতে পারে। পারদ সকল তরল পদার্থ অপেক্ষাই অধিক শীতল, কিন্তু তাপ লাগিলে উহা যেমন শীঘ্র উষ্ণ হয়, এমন আর কিছুই হয় না। পারাকে অনায়াসেই নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল ক্ষুদ্র অংশ সচরাচর গোলাকার হয়। ভূমিবিক্ষিপ্ত পারদ-গোলক সকল হস্তদ্বারা তুলিতে পারা যায় না। কেবল গোময় ও তদ্বিধ অন্য বস্তুদ্বারা ক্রমে ক্রমে তোলা যাইতে পারে।

পারদ সোণা, রূপা, রাঙ, দস্তা এই কয়েক ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়; সুতরাং ঐ সকল ধাতুকে পরিশোধিত করিবার পারাই প্রধান সাধন। অত্যল্পমাত্র

শৈত্যোষ্ণতাতেই পারার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এই কারণবশতঃ পারাদ্বারা তাপমানযন্ত্র প্রস্তুত হয়। পারাদ্বারা বায়ুমান-যন্ত্রও নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

পারা জমাইয়া কাচের পৃষ্ঠে দিলে সেই কাচে প্রতিবিম্ব পড়ে। জমাইবার প্রক্রিয়াও নিতান্ত কঠিন নহে। প্রথমতঃ রাঙ ও পারদ এই উভয়বস্তু যে কাচের পৃষ্ঠে লাগাইতে হইবে, সেই কাচের সমাকার কোন মস্থণ প্রস্তরফলকের উপরিভাগে রাখিয়া উত্তম রূপে মিশ্রিত করত উক্ত ফলকের সমুদায় পৃষ্ঠভাগে ঘন করিয়া লাগাইয়া দিতে হয়। অনন্তর কাচখানি ফলকের উপরিভাগে সমানভাবে স্থাপনপূর্ব্বক উপরি হইতে চাপ দিয়া ৩ | ৪ দিবস রাখিয়া দিলেই উক্ত মণ্ড কাচের পৃষ্ঠভাগে লগ্ন হওয়াতে দর্পণ প্রস্তুত হইয়া উঠে।

তিব্বত, আষ্ট্রিয়া, স্পেন, পেরু প্রভৃতি অনেক দেশে পারদের খনি আছে। উক্ত খনিসকলের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তের মধ্যে তরল পারদ গোলাকার হইয়া অবস্থিত থাকে। কিন্তু সচরাচর উহাকে গন্ধকের সহিত সম্মিলিত হইয়া হিঙ্গুলের আকারে পরিণতই দেখিতে পাওয়াযায়।

হিঙ্গুল হইতে পারাকে পৃথক্ করিতে হইলে হিঙ্গুল ও লৌহ-চূর্ণকে একত্র করিয়া অগ্নির উত্তাপ লাগাইলেই পারা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে এবং হিঙ্গুল-স্থিত গন্ধক লৌহের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপর এক পদার্থ উৎপাদন করিয়াথাকে। এইরূপ পারদ ও গন্ধক উভয়কে একত্র মাড়িয়া অগ্নির উত্তাপ সহকারে হিঙ্গুলও করা যাইতে পারে।

পারা অতি বিষবৎ পদার্থ। কাঁচা পারা বা তাহার

ধূম শরীরে প্রবিষ্ট হইলে অনেক অপকার হয়। কিন্তু ইহাতে অনেকবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়াথাকে। কালোমেল্ নামক ঔষধ পারাদ্বারাই প্রস্তুত হয়।

অভ্র।

অভ্র অতি স্বচ্ছ খনিজ পদার্থ। অগ্নির উত্তাপে অভ্র শীঘ্র দ্রবীভূত হয় না। এই নিমিত্ত কোন কোন স্থানে অভ্র-নির্ম্মিত স্থালীতে পাক কর্ম্ম সমাধান করিয়া থাকে। এতদ্দেশে প্রতিমাদির আভিরূপ্য বিষয়েই অভ্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়। ধনী লোকেরা বিবাহ প্রভৃতি উৎসব কার্য্যে অভ্রদ্বারা ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। অভ্রদ্বারা এতদ্দেশীয় কোন কোন ঔষধও প্রস্তুত হয়।

এতদ্দেশীয় অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, মেঘেরা পর্ব্বতে শালপত্র খাইতে আসিলে তাহাদের মুখহইতে যে লাল নির্গত হয়, তাহাতেই অভ্র জন্মে। ধূম হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, সুতরাং সে অচেতন জড় পদার্থ, অতএব তাহার পত্রভক্ষণ বা মুখহইতে লাল নির্গমন যে কিরূপ অসম্ভব ও অবিবেচকের কথা, তাহা বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেরই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

ফলতঃ পার্ব্বতীয় প্রদেশেই অভ্রের খনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিশেষতঃ বীরভূম ও বিহার প্রদেশে অভ্রের অনেক খনি আছে। যে সকল খনিতে স্লেট নামক প্রস্তর পাওয়া যায়, অভ্রও

প্রায় সেই সেই স্থানে পাওয়াগিয়াথাকে। স্লেট প্রস্তর এবং অভ্রের একরূপ সাদৃশ্য আছে—স্লেটও যেরূপ স্তরে স্তরে ঘটিত, অভ্রও সেইরূপ। অভ্রের স্তরসকল পৃথক্ করিয়া খুলিলে পর উহা অতিশয় পাতলা ও স্বচ্ছ হইয়াথাকে।

অভ্র দুইপ্রকার। একপ্রকার শ্বেত ও অপরপ্রকার কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ। উভয়রূপ অভ্রই খনিতে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়াযায়। অভ্রকে অনায়াসে চূর্ণ করিতে পারাযায়। অভ্রচূর্ণ দেখিতে অতি সুন্দর।

সীস।

সীস জল অপেক্ষা প্রায় সাড়ে এগার গুণ ভারী। এই ধাতুকে যেরূপ অনায়াসে নোয়াইতে পারা যায়, অন্য কোন ধাতুকে সেরূপ পারা যায় না। অন্যান্য ধাতুকে দ্রবীভূত করিতে যত উত্তাপ দিতে হয়, সীসে তত দিতে হয় না। রৌদ্র ও শিশিরে পড়িয়া থাকিলে সীসের কিছুই বিকৃতি হয় না, কেবল উপরিভাগের উজ্জ্বল বর্ণটাই মলিন হইয়া যায়।

সচরাচর যাহাকে সীসের পেন্সিল্ বলে, তাহা বাস্তবিক সীসের নহে। প্লম্বেগো নামক একপ্রকার পদার্থ ও একপ্রকার কর্দ্দম এই উভয় একত্র মিশ্রিত হইয়া তাহা প্রস্তুত হয়। সীসকে দ্রবীভূত করিলে তাহার উপরিভাগে যে ক্লেদ উত্থিত হয়, ঐ সকল ক্লেদ একত্র করিয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে সফেদা ও সিন্দূর প্রস্তুত হয়। ঐ সকল রঙ্ তৈলে গোলা

যাইতেপারে, এবং উহা অতিশয় বিষাক্ত। সীসেতে কোনপ্রকার অম্লরসের সংযোগ হইলেই উহা বিষাক্ত হইয়া উঠে। অতএব সীসের ভোজনপাত্রাদি ব্যবহার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

দুই ভাগ সীস ও এক ভাগ রাঙ্ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘটী বাটী ঝালিবার উত্তম পাইন্ প্রস্তুত হয়। বন্দুকের গুলি নির্ম্মাণে অনেক সীস ব্যবহৃত হয়। কিছু শক্ত ও উত্তমরূপ গোলাকার করিবার নিমিত্ত ইহাতে হরিতাল মিশাল দিয়াথাকে। যেরূপ ঝাঝুরীতে ঝুরী ভাজে, সেইরূপ উক্ত হরিতাল-মিশ্রিত সীসদ্রবকে ঝাঝুরীর মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ হইতে জলের উপর ফেলিলেই উত্তম গুলি প্রস্তুত হয়। রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া সীস-দ্বারা ছাপিবার অক্ষর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এবং ইহাতে রাঙ ও তামা মিশ্রিত করিলে পিউটার নামক একপ্রকার মিশ্রধাতু উৎপন্ন হয়।

গ্রেটব্রিটন, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি অনেক দেশে সীসের আকর আছে। আকরে গন্ধক-মিশ্রিত সীসই সর্ব্বদা পাওয়া যায়; এ নিমিত্ত খাটি সীস আকরে জন্মে কি না, এই বিষয়ে অনেকের সংশয় আছে।

গন্ধক-মিশ্রিত সীসের বিশুদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ ঐ বিমিশ্র ধাতুকে জলদ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করত পরিষ্কৃত করিতে হয়। পরে উহাকে একপ্রকার ভাঁটিতে চড়াইয়া অগ্নির উত্তাপ দিলেই উহার গন্ধক সকল উড়িয়াযায়। অনন্তর উহাকে একপ্রকার মৃদঙ্গারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দ্রবীভূত করিলেই বিশুদ্ধ সীস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লবণ সামান্যতঃ দুইপ্রকার। একপ্রকার খনিতে জন্মে, ও অপরপ্রকার সমুদ্রাম্বু হইতে উৎপাদিত হয়। লবণ বিশুদ্ধ হইলে উত্তম শ্বেতবর্ণ হয়। ইহার স্বনাম-প্রসিদ্ধ এক অপূর্ব্ব আস্বাদ আছে। লবণের এই রস নিজে সুস্বাদু নহে বটে, কিন্তু ইহা সংযুক্ত না হইলে আমাদিগের প্রায় কোন খাদ্যদ্রব্যই সুরস হয় না। লবণ অতিশয় জারক, কিন্তু ইহা অধিক মাখাইয়া রাখিলে কোন দ্রব্য শীঘ্র পচিয়া যায় না। লবণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা আছে।

সমুদ্রাম্বু বা লোণাজল কোন অগভীর পাত্রে রাখিয়া তাহাতে উত্তাপ প্রদত্ত হইলে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, সুতরাং লবণাংশ ঐ পাত্রেই পতিত থাকে। অনন্তর উহাকে জলে ফুটাইলে ও উহার ক্লেদ সকল বাহির করিয়া ফেলিলে উত্তম লবণ প্রস্তুত হয়। নারিকেল কদলী প্রভৃতি কোন কোন উদ্ভিজ্জেরও স্থানবিশেষে লবণের অংশ আছে। দগ্ধ করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে লবণ বাহির করা যাইতেপারে।

খনিজ লবণেরও সৈন্ধব, বিট, করকচ, খাড়ী প্রভৃতি নানাপ্রকার ভেদ আছে। ঐ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লবণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াথাকে। লাহোর, ইংলণ্ড, ইটালী, পোলাণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশে লবণের খনি আছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত খনিটী এক অতি মনোহর পদার্থ। উক্ত স্থানের আকর-চারী শিল্পকরেরা অস্ত্রদ্বারা ঐ সকল লবণাচলের মধ্যে মধ্যে উত্তম উত্তম প্রাসাদ, দেবালয়, রঙ্গভূমি ও প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছে। যখন্ উহার মধ্যে প্রদীপ সকল প্রজ্বালিত হয়, তখন ঐ আলোক চতুর্দ্দিকস্থ নির্ম্মল লবণময়

ভিত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া যে কিরূপ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদনকরে, তাহা না দেখিলে কোন প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, এই খনি সহস্রবৎসরপর্য্যন্তপৃথিবীস্থ সমুদায় লোকের লবণ-প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিতে পারে।

আমাদিগের দেশে লবণ অতিশয় সুলভ, কিন্তু আফ্রিকার মধ্যভাগে ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। তথায় যে ব্যক্তি ভোজনের সময়ে লবণ খাইতে পায়, সেই ভাগ্যবান্ বলিয়া পরিগণিত। আবিসীনিয়া দেশের লোকেরা আত্মীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের নিকটস্থিত লবণখণ্ড পরস্পরকে লেহন করিতেদেয়। এই ব্যবহার তাহাদিগের প্রকৃত বন্ধুতার এক চিহ্নস্বরূপ। ঐ দেশে সূর্য্যের উত্তাপে মুখ সর্ব্বদাই শুষ্ক হইয়া যায়, তজ্জন্য সকলেই আপন আপন সমভিব্যাহারে এক এক খণ্ড লবণ রাখে, এবং অত্যন্ত মুখশোষ হইলে উহা চাটিয়া থাকে। আরব দেশের লোকদিগের এরূপ প্রথা আছে যে, তাহারা দৈবক্রমেও যাহার লবণ একবার চাটিয়াছে, তাহার সহায়তা বা তাহাকে রক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকে।

তাম্র।

এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় আট গুণ ভারী, এবং লৌহভিন্ন সকল ধাতু অপেক্ষাই অধিক স্থিতিস্থাপক। তামা হইতেও সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক যবোদরমাত্র স্থূল তারে প্রায় তিন মণ ত্রিশ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না। তামা, সোণা ও রূপা

অপেক্ষা অধিক উত্তাপে, কিন্তু লৌহ অপেক্ষা অল্প উত্তাপে দ্রবীভূত হয়।

জাহাজ ও অন্যান্য অর্ণবযান সকলের তলভাগ তামার পাতে মুড়িয়াথাকে। এরূপ করাতে জলের সহিত জাহাজের ঘর্ষণ কম হয়, তজ্জন্য জাহাজ শীঘ্রগামী হয়, এবং উহার তলভাগ জলজন্তুগণ ভেদ করিতে পারে না।

তামা হইতে পয়সা ও রন্ধনের স্থালী প্রস্তুত হয়। কিন্তু তামাতে কোন অম্লরসযুক্ত বস্তু অধিকক্ষণ থাকিলেই উহা বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই জন্য উক্ত স্থালীসকলের অভ্যন্তরে রাঙের কলাই করিয়া, রন্ধনাদি করিয়াথাকে। ফলতঃ তাম্রপাত্রে কোন দ্রব্যই ভোজন করা উচিত নহে। অন্য দ্রব্যের সহিত ঘর্ষণ হইলে লৌহে যেরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিয়াথাকে, তাম্রে সেরূপ উঠে না। এই নিমিত্ত বারুদের কারখানায় তাম্রনির্ম্মিত উপকরণই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। তাম্র-ফলকে অক্ষর ও প্রতিমূর্ত্তি উত্তমরূপে খোদা হইয়া থাকে।

তাম্রের উপরিভাগে বিনিগার নামক মদ্য বা তাদৃশ অন্য কোন পদার্থ প্রদান করিলে হরিতবর্ণ একপ্রকার কলঙ্ক উৎপন্ন হয়। ঐ কলঙ্ককে বর্দ্দিগ্রিস্ বলে। কোন তাম্রপাত্র অধিকদিন অমার্জ্জিত থাকিলে উহার উপরিভাগে যে কলঙ্ক দেখাযায়, উহাই বর্দ্দিগ্রিস। বর্দ্দিগ্রিস অতিবিষবৎ পদার্থ, উহাদ্বারা চিত্রকরদিগের একপ্রকার রঙ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দুই ভাগ তামাতে এক ভাগ দস্তা মিশ্রিত করিলে উত্তম পিত্তল প্রস্তুত হয়। পিত্তল আমাদিগের অনেক উপকারে আইসে। উহাদ্বারা ঘটী, বাটী, থালা, গাড়ু,

প্রভৃতি আমাদিগের অনেক গৃহসামগ্রী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তামার ন্যায় পিত্তলে শীঘ্র মরিচা ধরে না। পিত্তলের অতি উত্তম তার প্রস্তুত হয়। ঐ সকল তার বাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং উহাদ্বারা অতি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কৃত জাল প্রস্তুত হয়। উত্তম পিত্তলের বর্ণ প্রায় সোণার ন্যায় হয়। পিত্তল হইতেও বর্দ্দিগ্রিস উৎপন্ন হইয়াথাকে। পিলসূজের গাত্রে যে কলঙ্ক দেখা যায়, উহাই বর্দ্দিগ্রিস।

তিন ভাগ তামা ও এক ভাগ রাঙ মিশ্রিত করিলে উত্তম কাঁসা হয়। কাঁসাতে থালা, ঘটী, বাটী, এবং ঘন্টা, ঘড়ি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ, গ্রেটব্রিটন ও আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশে তামার আকর আছে। আকরে কথন রাশি রাশি বিশুদ্ধ তামা পাওয়া যায়, কথন বা অন্যান্য দ্রব্যের— বিশেষতঃ গন্ধকের—সহিত মিশ্রিত পাওয়া গিয়া থাকে। সীসকে যেরূপ অগ্নির উত্তাপে বিশুদ্ধ করা যায়, বিমিশ্র তামাও সেইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা বিশোধিত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ তামা লালবর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর।

যবক্ষার বা সোরাকে সামান্যতঃ খনিজমধ্যে গণনা করা যায়; কিন্তু উহা খনির অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয় না, মৃত্তিকার উপরিভাগেই জন্মিয়া থাকে। স্পেন, ইটালি, ফ্রান্স, চিলি প্রভৃতি নানাদেশে সোরা পাওয়া গিয়াথাকে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভারতবর্ষেই উহা প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়াযায়। পুরাতন ভিত্তির উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে যে শ্বেতবর্ণ এক প্রকার পদার্থ হইতে দেখাযায়, তাহাই সোরা। বস্তুতঃ উহা চূর্ণ-প্রস্তর বালুকা-প্রস্তর প্রভৃতি সচ্ছিদ্র নানাবিধ প্রস্তরের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুঁড়ার ন্যায় ঐ রূপেই জন্মিয়া থাকে, বিশেষতঃ যে স্থানে বিষ্ঠামূত্র প্রভৃতি পচিয়া থাকে, সেই স্থানেই অধিক জন্মে। প্রথমতঃ ঐ সকল গুঁড়াকে সম্মার্জ্জনীদ্বারা একত্র করিয়া জলে গুলিয়া স্থির করিয়া রাখিতে হয়। অনন্তর উহার নিম্নভাগে যে সারপদার্থ পড়ে, তাহাই অগ্নির উত্তাপে পরিশোধিত হইয়া দানা বাঁধিলে উত্তম সোরা প্রস্তুত হয়।

তামাক, বিটপালঙ্গের মূল প্রভৃতি কোন কোন উদ্ভিজ্জেও সোরা পাওয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয় মহাশয়েরা ঐ সকল উদ্ভিজ্জ এবং পূর্ব্বোক্ত বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি হইতে কৌশলদ্বারা সোরা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে স্পেন, ইজিপ্ট—বিশেষতঃ ভারত-বর্ষে—স্বভাবতই বর্ষে বর্ষে এত সোরা উৎপন্ন হয় যে, আর উহা প্রস্তুত করিবার পরিশ্রমের আবশ্যকতা রাখে না।

সোরা দেখিতে প্রায় কোন কোন লবণের ন্যায়। উহার আস্বাদও লবণ বটে, কিন্তু ঈষৎ তিক্ত। সোরা

দ্বারা কোন কোন ঔষধ প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে গন্ধক হইতে যেরূপ দ্রাবক হয় বলা গিয়াছে, সোরা হইতেও সেইরূপ একপ্রকার দ্রাবক হইয়াথাকে। উহাকে যবক্ষার-দ্রাবক বা 'নাইট্রিক্ এসিড্' বলে। উহার এমত তেজঃ যে, রৌপ্যও উহাতে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

সোরার অতিশয় দাহ্যতা গুণ আছে। এই গুণ থাকাতে উহা বারুদ নির্ম্মাণে অত্যন্ত উপযোগী হয়। সোরা না থাকিলে যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, কামান প্রভৃতি কিছুই কার্য্যকারী হইতে পারিত না।

লৌহ।

লৌহ, রাঙ এবং দস্তা ভিন্ন সকল ধাতুর অপেক্ষাই লঘু। জল অপেক্ষা প্রায় সাড়ে সাত গুণ ভারী। এই ধাতু হইতে কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার এক যবোদরমাত্র স্থূল তারে ৬ মণ /৭ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না। লৌহের ন্যায় আমাদিগের প্রয়োজনীয় ধাতু আর কিছুই নাই। ভূমিকর্ষণ, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ অথবা যে কোন শিল্প কর্ম্ম আছে, ইহা ব্যতিরেকে তাহার কিছুই সম্পন্ন হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ, সুইডেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশেই প্রচুরপরিমাণে লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে সুই-ডেনের লোহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। উহাকে সচরাচর সুইলিস্ লোহা কহিয়া থাকে। আকর হইতে যে

লৌহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে মাটি, চূণ, চূর্ণপ্রস্তর প্রভৃতি অনেক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ করিতে হইলে উহাতে সাতিশয় উত্তাপ লাগাইতে হয়। ঐ উত্তাপে অন্যান্য দ্রব্য উড়িয়া গেলেও মাটি ও চূণ কিঞ্চিৎ রহিয়াযায়। কিন্তু ঐ বস্তুদ্বয় যখন লৌহে সমানভাগে থাকে, তখন উহারা পরস্পরই পরস্পরকে গলাইয়া পৃথক করিবার চেষ্টা করে। এইজন্য লৌহ গলাইবার সময়ে বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিয়া উহাতে উক্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যাহা কম থাকে, তাহা প্রদান করিতে হয়। ঐরূপ করিয়া ভস্ত্রাদ্বারা সাতিশয় উত্তাপ প্রদান করিতে করিতে উক্ত মৃত্তিকাদি মিলিত হইয়া লৌহের উপর ভাসিতেথাকে। উহাকে লৌহবিষ্ঠা বা মণ্ডূর কহে। ঐকালে লৌহ, শুদ্ধ অঙ্গার ও চূর্ণ-প্রস্তরের সহিত দ্রবীভূত হইয়া ভারপ্রযুক্ত নিম্নে পড়িয়া যায়। তখন ঐ হাপরের নিম্নভাগে যে ছিদ্র থাকে, তাহা খুলিয়া দিলে পর উক্ত লৌহদ্রব অগ্নিময় স্রোতের ন্যায় বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ শীতল ও কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাকেই ঢালালোহা কহে। ঢালা লোহা এরূপ কঠিন হয় যে, তাহাকে হাতুড়ির আঘাতেও পাত করিতে পারাযায় না, অধিক লাগিলে ভাঙ্গিয়া যায়। তৎকালে উহা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। উহাদ্বারা একপ্রকার কটাহ, রেলওয়ের রেইল ও কামানের গোলা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

ঢালালোহা হইতে পেটালোহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রথমতঃ ঢালালোহাকে হাপরে ফেলিয়া দ্রবীভূত করত অনবরত দুই ঘণ্টাকাল নাড়িতে হয়। ঐ কালে উহার অভ্যন্তরস্থ অঙ্গারভাগ অনেক দগ্ধ হইয়া

যায় এবং ক্রমে ক্রমে উত্তাপ কমাইলে পর যখন উহা ঘনীভূত হয়, তখন তপ্ত থাকিতে থাকিতেই বাহির করিয়া হাতুড়িদ্বারা উত্তমরূপে পিটিয়া অর্গলের আকার করিয়া রাখে। ইহাকেই পেটালোহা কহা গিয়াথাকে। পেটালোহা হইতে তার ও কটাহ প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত হয়। উহা অতিশয় দৃঢ় হয়, সুতরাং সমুদায় যন্ত্র ও অস্ত্র শস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লৌহ ও ইস্পাত ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ধাতু বলিয়া অনেকের বোধ আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইস্পাত, লৌহ হইতেই প্রস্তুত হইয়াথাকে। পূর্ব্বে যে ঢালা ও পেটা লোহার কথা উক্ত হইয়াছে, সেই উভয়বিধ লোহা হইতেই ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢালাতে করিতে হইলে উহা হইতে অঙ্গারের কিয়দংশ বাহির করিয়া দিতে হয়, আর পেটা হইতে করিতে হইলে তাহাতে কিয়দংশ অঙ্গার প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ,—প্রথমতঃ উক্ত অর্গল সকলকে বৃহৎ বৃহৎ মৃণ্ময় মুচির অভ্যন্তরে জ্বলন্ত অঙ্গারের সহিত পুরিয়া মুখভাগ বন্ধ করত ৫।৬ ঘণ্টাকাল সাতিশয় উত্তাপ প্রদান করিলেই উহার অভ্যন্তরস্থ লৌহার্গল সকল অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইস্পাত হইয়া উঠে। রক্তবর্ণ উত্তপ্ত ইস্পাতকে যদি অগ্নি হইতে বাহির করিয়া বাতাসে ক্রমে ক্রমে শীতল করা যায়, তাহা হইলে উহা অতিশয় নরম হয়। কিন্তু যদি উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতেই জলে ডুবান যায়, তাহা হইলে উহা বিলক্ষণ কঠিন, ভঙ্গপ্রবণ ও স্থিতিস্থাপক হয়। এই অবস্থায় ইহাকে অতি পরিষ্কৃতরূপে প্যালিস করিতে পারা যায়।

উক্তরূপ কঠিন ইস্পাতকে পুনর্ব্বার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বায়ুতে ক্রমে ক্রমে শীতল করিলে পুনর্ব্বার নরম হয়। অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে ইস্পাতে ক্রমে ক্রমে ধূসর, পীত, বেগুণে, বাইওলেট, রক্ত ও গভীর-নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণের দ্বারাই উহাতে কত তাপ হইয়াছে, তাহা অনুমিত হইয়া থাকে। ইস্পাতে সমুদায় ধারাল অস্ত্র ও ঘড়ির স্প্রিঙ্ সকল নির্ম্মিত হয়।

যে সকল রোগে শরীরে রক্তের হ্রাস হয়, চিকিৎসকেরা সেই সকলরোগে লৌহঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমাদিগের শরীরস্থ রক্তে লৌহের অংশ আছে। লৌহের উপরিভাগে যে রাঙা মরিচা দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা হইতে লালরঙ প্রস্তুত হয়। বোধ হয় এই জন্যই সংস্কৃত ভাষায় রাঙারঙের নাম লোহিত হইয়াছে।

আমাদিগের দেশে যাহাকে অয়স্কান্তমণি বা চুম্বক-প্রস্তর কহে, তাহাও লৌহের অবস্থাভেদ মাত্র। অয়স্কান্তমণি সমীপস্থ অন্যান্য লৌহকে আকর্ষণ করিয়া-থাকে এবং তাহা যদি অন্যলৌহে ঘর্ষণ করা-যায়, সেই লৌহও উক্ত মণির গুণ প্রাপ্ত হয়। অয়স্কান্তমণির আর এক অসাধারণ গুণ এই যে, উহার নির্ম্মিত একটী শলাকা চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে এমত করিয়া রাখিলে উহার একপ্রান্ত নিয়তই উত্তর-দিকে, সুতরাং অপরপ্রান্ত দক্ষিণ দিকে থাকে। অয়স্কান্তের এই গুণ থাকাতে দিগ্দর্শননামে যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ যন্ত্র সমভিব্যাহারে থাকিলে কি অকূল সমুদ্র, কি ভয়ানক প্রান্তর, কি অন্ধতমসাবৃত

আকরাভ্যন্তর, কোথাও দিগ্‌ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

চূর্ণ।

চূর্ণ খনিতেও জন্মে এবং অন্য প্রকারেও প্রস্তুত হয়। খনিজ চূর্ণ কোথাও বিশুদ্ধ পাওয়াযায় না—জল ও অঙ্গারদ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই দ্রব্য যেমন আমাদিগের সাতিশয় প্রয়োজনীয়, তেমনি জগদীশ্বর ইহাকে প্রচুরপরিমাণে উৎপাদন করিয়া রাখিয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগে যে সকল মৃত্তিকাদি আছে, তাহার সমুদায়ের অষ্টমাংশ চূর্ণ। অট্টালিকানির্ম্মাণ, কৃষিকার্য্য ও ঔষধ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি অনেককার্য্যেই চূর্ণের অনেক উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। চূর্ণ অঙ্গারদ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হইয়া চূর্ণ-প্রস্তর, চা-খড়ি ও মার্ব্বেল প্রভৃতি বিবিধাকার দ্রব্য হইয়াথাকে। এইরূপ উহা অন্যান্য দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হইয়া, অন্যান্য প্রকার আকার ধারণ করে। কড়ি, শামুক, গুগলি, ও অস্থিতে ৮/১০ ভাগ ও পাখীর ডিমের খোলায় ৯/১০ ভাগ চূর্ণ থাকে।

চা-খড়ি, চূর্ণ-প্রস্তর, জোঙ্গড়া, শামুক, গুগলি প্রভৃতি—ইহাদিগকে দগ্ধকরিয়া সচরাচর চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। উহাদিগকে দগ্ধ করিতে হইলে—এক এক থাক্ কাষ্ঠ ও এক এক থাক্ ঐ সকল দ্রব্য ভাঁটিতে সাজাইয়া অগ্নি প্রদান করিতে হয়। ঐ অগ্নিতে

উহারা উত্তমরূপে দগ্ধ হইলেই চূর্ণ হইয়া উঠে। সেই অবস্থায় উহাকে বাখারিচূণ বলে। উহা শুভ্রবর্ণ ও অতিশয় ক্ষার হয়। অনন্তর উহাতে জল দিলেই ফুটিয়াউঠে—গুঁড়াহয় ও সাতিশয় উত্তাপ বিকরণ করে। ইহাকেই চূণফুটান কহে। ফুটান চূণকে জল দিয়া মণ্ডের ন্যায় করিয়া ভালরূপে ঘুঁটিলেই কলিচূণ প্রস্তুত হয়। কলি ও গুঁড়াচূণ উভয়ই অট্টালিকানির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের এক প্রধান উপাদান।

চূণ কোন কোন দেশের ভূমিতে সারের কার্য্যও করিয়া থাকে অর্থাৎ অনুর্ব্বর কঠিন ভূমিতে কিঞ্চিৎ চূণ প্রদান করিলে উহার মৃত্তিকাসকল শিথিল হইয়া বিলক্ষণ উর্ব্বরতাপ্রাপ্ত হয়। চূণের, দুর্গন্ধ ও ক্ষুদ্রকীটাদি নষ্টকরিবার অতিশয় সামর্থ্য আছে। চর্ম্মকারেরা চূণ মাখাইয়া চর্ম্মের লোমসকল উৎপাটন করিয়াথাকে।

চূণ, অঙ্গার-দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে যেসকল চূর্ণ-প্রস্তর প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে, প্রায় সকল দেশেই তাহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এতদ্দেশে যেসকল চুণ ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই শ্রীহট্ট দেশ হইতে আসিয়াথাকে। উক্তপ্রস্তর ও পূর্ব্বোক্ত জোঙ্গাড়ার চূণ সকল যেরূপ শুভ্রবর্ণ হয়, গুগ্‌লি শামুকের চূণ সেরূপ হয় না।

রঙ্গ।

এই ধাতু জলঅপেক্ষা ৭ গুণ ভারী। রৌপ্য অপেক্ষা নরম কিন্তু সীস অপেক্ষা কঠিন। ইহাকে পিটিয়া উত্তম পাত প্রস্তুত করিতে পারাযায়।

রাঙদ্বারা পেট্‌রা, বাক্‌স, ও রন্ধনের স্থালী প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। রাঙের ইংরাজী নাম টিন্‌। এই জন্যই সচরাচর উহারা টিনের দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াথাকে। কিন্তু ঐসকল দ্রব্য কেবল রাঙেই নির্ম্মিত নহে। উহাদিগের নির্ম্মাণের প্রকার এইরূপ—পাতলা-লৌহপাতকে বালী ও জলদ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কার করত দ্রবীভূত রাঙে ডুবাইয়া লইতে হয়। অনন্তর উহাকে গন্ধকদ্রাবক-মিশ্রিত জলেতে ডুবাইয়া লইলেই সমুদয় লৌহপাতটা এরূপে রাঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় যে, উহাকে কাটিলেও অভ্যন্তরে রাঙের বই লৌহের বর্ণ দেখিতে পাওয়াযায় না; তাহাতেই স্থালী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াথাকে। যে সকল আল্‌পিন্‌ সচরাচর দেখিতে পাওয়াযায় তাহাও পিত্তলের তারে নির্ম্মিত, কেবল রাঙেরদ্বারা ভিন্নবর্ণীকৃত হইয়াথাকে। এইরূপ কার্য্যে রাঙ অনেক ব্যবহৃত হয়। রাঙের দ্বারা চিত্রকরদিগের একপ্রকার রঙও প্রস্তুত হইয়াথাকে। আমাদিগের দেশে প্রতিমাদি সাজাইবার নিমিত্ত যে সকল রাঙ্‌তা ও ডাক্‌ ব্যবহৃত হয়, তাহাও রাঙ্‌ হইতেই প্রস্তুত হইয়াথাকে। রাঙের সহিত অন্যান্য ধাতুর সংযোগে যে কাঁসা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাঙের পাতেরদ্বারা অনেক ধাতুর উপর কলাই হইয়াথাকে।

ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, চিলি, মেক্‌সিকো প্রভৃতি অনেক দেশে রাঙ্‌ প্রাপ্ত হওয়াযায়। বিশুদ্ধ রাঙ্‌ কুত্রাপি পাওয়াযায় না। উহা সচরাচর তাম্র ও গন্ধকের সহিত মিশ্রিতই দৃষ্ট হইয়াথাকে। আকর হইতে বাহির করিয়া অগ্নিসংযোগে উহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বিশুদ্ধ রাঙ্‌ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও উজ্জ্বল!

হরিতাল।

হরিতাল, বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুইপ্রকারই আকরে পাওয়াযায়। বিমিশ্র হরিতালে গন্ধক, তামা, লৌহ প্রভৃতি নানাবস্তুর সংযোগ থাকে। অগ্নির উত্তাপদ্বারা উড়াইয়া হরিতালকে ঐ সকল বস্তু হইতে পৃথক্‌ করিয়া লইতে হয়।

হরিতাল অতিশয় বিষবৎ পদার্থ। "সেঁকো" নামক বিষ উহা হইতেই প্রস্তুত হইয়াথাকে। হরিতাল অগ্নির উত্তাপ পাইলে লশুনের ন্যায় একপ্রকার দুর্গন্ধ উৎপাদন করত শুভ্রবর্ণ ধূমের আকারে উড়িয়া যায়। ঐ সকল ধূমকে কৌশলপূর্ব্বক কোন সুস্নিগ্ধ পাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেই উহারা বসিয়া যে শ্বেতবর্ণ একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সেঁকো বলে। সেঁকো অতিশয় ভয়ানক পদার্থ। উহা খাইলে বমন ও পাকস্থলীতে সাতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে হাত পা খেঁচিয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সেঁকো গরল হইলেও উহা আমাদিগের অনেক উপকারে আইসে। উহাদ্বারা একপ্রকার রঙ প্রস্তুত হয়। উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটসকল নষ্ট হয় বলিয়া আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা পুস্তকের পত্রসকলে উহামিশ্রিত মণ্ড মাখাইয়া রাখিতেন। চিকিৎসকেরা উহাদ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াথাকেন। অনেকে সেঁকোমিশ্রিত দ্রব্য খাওয়াইয়া ইন্দুর মারিয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন ভাগানুসারে গন্ধক মিশ্রিত হওয়াতে উক্ত খনিজের দুইপ্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। একপ্রকার অতি সুন্দর পীতবর্ণ ও অপরপ্রকার রক্তবর্ণ হয়। এই পীতবর্ণ পদার্থকে হরিতাল ও রক্তবর্ণকে মনঃশিলা অর্থাৎ মনছাল বলিয়া থাকে। এই উভয়বিধ পদার্থ চিত্রকর্ম্মের সাতিশয় উপযোগী। বিশেষতঃ বারুদের সহিত মনছাল মিশাইয়া কয়েকপ্রকার আতোষবাজি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

দস্তা।

দস্তা ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। ইহা জল অপেক্ষা প্রায় সাড়ে ৬ গুণ ভারী। এই ধাতু আকরে প্রায় বিশুদ্ধ পাওয়া যায় না। বালুকা ও অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় অগ্নিসংযোগে ইহাকেও বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

সীসের ন্যায় দস্তাতেও অধিক মরিচা ধরে না। এই নিমিত্ত ইহাদ্বারা জলাধার, জলের নালী প্রভৃতি

নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দস্তাতে উত্তম ছাঁচ ও দোয়াৎ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রসায়নবেত্তারা দস্তা ও গন্ধক-দ্রাবক দ্বারা জল হইতে হাইড্রোজিন্ গ্যাস্ প্রস্তুত করেন।

ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক দেশে দস্তার আকর আছে। তামা ও দস্তা মিশ্রিত হইয়া পিত্তল হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাদের ভাগের তারতম্যানুসারে পিত্তলের বর্ণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। ২ভাগ তামা, ১ভাগ নিকল্ ও ১ভাগ দস্তা মিশ্রিত করিলে জর্ম্মাণসিল্বর বা রূপদস্তা নামে অপর একপ্রকার ধাতু উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এই ধাতুতে চামচ, পেয়ালা, দোয়াত, কলমদান প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

তাম্বুল।

তাম্বূল (পান) একপ্রকার লতার পত্র। ভারত-বর্ষীয়দিগের মধ্যে তাম্বূলের ব্যবহার এত প্রচলিত যে, ইহার আকার প্রকার বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। এদেশে এমত পরিবারই নাই, যাহার মধ্যে প্রতিদিন অন্ততঃ দশকড়ারও পান না আইসে।

পানের চাস ও পানবিক্রয় করিবার জন্য এদেশেব মধ্যে একটী পৃথক্ জাতি আছে; ঐ জাতিকে বারুই কহে। বারুইএরাই অধিকাংশ পানের ব্যবসায় করিয়া-থাকে। যে ক্ষেত্রে পান রোপণ করিতে হইবে, তা-হাকে কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ করিতে হয়, অর্থাৎ ঐ ক্ষেত্রের মধ্যভাগ উচ্চ করিয়া চতুষ্পার্শ্ব এরূপ অবনত করা আবশ্যক যে, বৃষ্টি হইলে শীঘ্রই সমুদয় জল ক্ষেত্র হইতে নির্গত হইয়া যাইতে পায়। ঐ ক্ষেত্রের চতু-র্দ্দিকে প্রথমতঃ সজীব বৃক্ষাদিদ্বারা বেড়াদিয়া শর খড়ি বা তাদৃশ অপর দ্রব্যদ্বারা উহার উপরিভাগ পর্য্যন্ত সমুদয় উত্তমরূপে আবৃত করিয়া দিতে হয়। কারণ গোড়ায় জল বসিলে বা ঝড় রৌদ্র অধিক লাগিলে পান নষ্ট হইয়াযায়। এইরূপ আবৃতক্ষেত্রকে পানের বোরজ কহে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বোরজের মধ্যে সারি সারি আলির মত করিয়া তন্মধ্যে পানের মূল বা লতার গ্রন্থিল ভাগ রোপণকরে এবং ঐ আলির পার্শ্বে উপরিস্থ আবরণে সংলগ্ন করিয়া বরাবর জাফ্রি বসাইয়ারাখে। পানের অঙ্কুরসকল বাহির হইয়া ঐ জাফ্রির উপর লতাইয়া উঠে; ঐ লতার পত্রকেই পান বা তাম্বূল কহে। পানের মূলে সর্ব্বদাই জল সেচন করিতে হয়, এ জন্য জলাশয়ের সন্নিহিত স্থানেই বোরজ করিয়াথাকে।

পান সকল অধিকদিনের হইয়া পরিপক্ক হইলেই উৎকৃষ্ট হয়, এজন্য লতার মূল হইতে ক্রমশঃ উপরি-ভাগের পান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। পাকাপান পুরু ও অপেক্ষাকৃত সুস্বাদ হয় এবং টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়; নূতনপান ঝাল, বিস্বাদ ও নেক্ড়ার ন্যায় নরম

হয়। জলদিয়া রাখিলে পাকা পান অনেকদিন পর্য্যন্ত তাজা থাকে, কিন্তু নূতনপান শীঘ্র পচিয়াযায়। আমরা সংচরাচর যে সকল পান ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা ভিন্ন সাঁচী, গোব্‌রাসাঁচী, মগেয়া, কর্পূরকাইত্‌ প্রভৃতি আরও কয়েকপ্রকার পান আছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত সুবর্ণ, সুগন্ধ ও সুস্বাদ হয়।

বাঙ্গালাদেশের মধ্যে হাবড়ার দক্ষিণ, গঙ্গা ও কাঁসাই নদী এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই উত্তম ও অধিক পান জন্মে। পঞ্জাব ভিন্ন ভাতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পান প্রচলিত আছে; কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ও উড়িষ্যাদেশের লোকেরা যত পান ব্যবহার করে, অন্য কোনদেশের লোকেরা বোধ হয় তত করে না। স্থানবিশেষে এরূপ লোক অনেক আছে, যাহারা প্রাতঃকাল অবধি সমস্তদিনই পান চিবাইয়া থাকে।

চূণ, সুপারি, খএর এবং (অবস্থানুসারে) অপরাপর মসলার সহিত খিলি করিয়া পান চর্ব্বণ করিয়াথাকে। সাহেবেরা এবং তাঁহাদের ব্যবহারের অনুকারী অনেক বাঙ্গালীরাও পানখাওয়াকে অসভ্যতার কার্য্যস্বরূপ জ্ঞান করেন। বাস্তবিকও অনবরত পান চর্ব্বণ করায় মুখবিকৃতি ও অসভ্যতাপ্রকাশই হয় বটে, কিন্তু সেরূপ না করিয়া আহারের পর ২।১টা তাম্বূল ভক্ষণ করিলে তাদৃশ অসভ্যতাপ্রকাশ হয় না। উহা দ্বারা জিহ্বার বৈজাত্য নষ্ট হয়, মুখের শোভা হয় এবং পরিপাকশক্তি বিষয়েও অনেক সুবিধা হয়। যেহেতু মুখের মধ্যে একপ্রকার লালা আছে, সেই লালা আহারদ্রব্যের সহিত যত অধিক সংশ্লিষ্ট হয়, ততই সেই দ্রব্যের পরিপাক হয়; তাম্বূলচর্ব্বণের দ্বারা

ঐ লালা অধিকপরিমাণে উদরস্থ হওয়াতে পরিপাক শক্তিকে বিলক্ষণ বর্দ্ধিত করে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তাম্বূলভক্ষণের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও নিন্দনীয় নহে।

আমাদিগের বৈদ্যক শাস্ত্রানুসারে তাম্বূল বায়ু, ক্রিমি ও কফ রোগের বিনাশক ও বলবৃদ্ধিকারক এবং ধারক। তাম্বূলের এই সকল গুণ আছে বলিয়া তাম্বূলের এবং তাম্বূলরসের সহিত বৈদ্যক মতানুযায়ী অনেক ঔষধ সেবিত হইয়াথাকে। অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে তাম্বূল দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার রীতি অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালে স্থানবিশেষে তাম্বূলপ্রাপ্তি এক মহাসম্মানের চিহ্ন ছিল। একজন সংস্কৃত কবি এই বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন যে "আমি কান্যকুব্জের রাজার নিকটে দুই খিলি তাম্বূল ও আসন পাইয়া থাকি!"।

বৃক্ষের পত্রকে 'পর্ণ'ও কহে, সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় তাম্বূলও 'পর্ণ' নামে অভিহিত হইয়াথাকে। বোধ হয় ঐ পর্ণ শব্দেরই অপভ্রংশ হইতে 'পাণ' বা 'পান' এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। পান এতদ্দেশে অতিপ্রাচীন কাল অবধি বিশেষরূপে ব্যবহৃত আছে।

গুবাক।

গুবাক বা সুপারির বর্ণ আকার প্রভৃতি বোধহয় সকলেই দেখিয়াছেন। ইহা যে, এক প্রকার ফলের

অভ্যন্তরস্থ বীজ তাহাও অনেকে জানেন। বাঙ্গালার দক্ষিণ প্রদেশে অর্থাৎ হুগলী, বারাসত, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অনেক জেলাতেই সুপারিবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। বোধহয় সমুদ্রের সন্নিহিত অথবা নিম্নদেশই সুপারিবৃক্ষ জন্মিবার প্রকৃত স্থান। ভারতবর্ষের দক্ষিণাত্যদেশে যত সুপারিবৃক্ষ জন্মে, এত আর কুত্রাপি জন্মে না।

তাল খর্জ্জূর ও নারিকেল যেজাতীয় বৃক্ষ, সুপারিও সেইজাতীয়। বিশেষতঃ নারিকেলবৃক্ষের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কেবল নারিকেলবৃক্ষ যত স্থূল, ইহা তত স্থূল নহে এইমাত্র। শ্রেণীবদ্ধ সরল ও উচ্চ সুপারিবৃক্ষসকল উদ্যানমধ্যে পরমসুন্দর দেখায়!

তালপ্রভৃতির ন্যায় সুপারিও বৃক্ষের অগ্রভাগে কান্দি কান্দি উৎপন্ন হয়। ফলসকল পরিপক্ব হইলে, পাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে। শুষ্ক হইয়া যখন বীজটা অভ্যন্তরে নড়িতে থাকে এমন হয়, তখন উহার উপরিস্থ ত্বকের একদিক্ কাটিয়া খুলিয়া ফেলিলেই গোল গোল সুপারি বাহির হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুপারিখণ্ড শুদ্ধ অথবা তাম্বূলের সহিত চর্ব্বণ করিয়াথাকে; ইহাতেই ভারতবর্ষমধ্যে প্রচুরপরিমাণে সুপারি ব্যবহৃত হয়। সুপারির আস্বাদ কিঞ্চিৎ কষায়; ইহাতে কিঞ্চিৎপরিমাণে মাদকতা শক্তিও আছে। এই জন্য সুপারি খাইলে কখন কখন ঘোর লাগে। ঐ শক্তি নূতন সুপারিতে যেরূপ থাকে, পুরাতনে তাহা অপেক্ষা ন্যূন হয়।

সুপারি দুইপ্রকার দেখিতে পাওয়াযায়; একপ্রকার দেশীয় ও অপরপ্রকার জাহাজী। মান্দ্রাজ বোম্বে

প্রভৃতি দেশ হইতে বণিকেরা জাহাজ করিয়া যে সকল সুপারি লইয়া আইসে, তাহাকে জাহাজী সুপারি কহে। দেশী সুপারি অপেক্ষা জাহাজী সুপারি কিছু বড় এবং তাহাতে মাদকতাশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল সুপারিকে জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ বাহির করিয়া লয় এবং সেই কাথ একপ্রকার খএর প্রস্তুত হইবার এক উপাদান হয়।

সুপারি তাম্বূলের একপ্রধান উপকরণ এবং উহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি, অগ্নির উদ্দীপ্তি ও বলবৃদ্ধি হয়, এই কারণে লোকে সুপারি ভক্ষণ করিয়াথাকে।

খদির।

খদির (খএর) আমাদের নিত্যব্যবহারের বস্তু। তাম্বূলের সহিত খদির ভক্ষণের রীতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। খদির পিঙ্গলবর্ণ, চূর্ণনীয়, দ্রাব্য ও তিক্তকষায়। উত্তম খদিরের উপরিভাগে একপ্রকার কৃষ্ণলোহিত রঙ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভাঙ্গিলে ভিতরে হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ লক্ষিত হয়; গোলা খদিরের বর্ণে লোহিতের ভাগই অধিক দেখাযায়।

ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই বিশেষতঃ বোম্বে ও বাঙ্গালা-দেশে 'বাব্‌লা' বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকময় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খদিরবৃক্ষ জন্মিয়াথাকে। খদিরের কাষ্ঠ যজ্ঞীয় হোমে ব্যবহৃত হয়, এজন্য গ্রহাচার্য্যেরা কখনও যজ্ঞকাষ্ঠার্থ

স্ব স্ব ভবনে খদিরবৃক্ষ রোপণ করিয়ারাখেন। উক্ত বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সারভাগটা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া জলে সিদ্ধ করিতে করিতে মধুর ন্যায় একপ্রকার ঘন পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহা তথাহইতে তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই খদির প্রস্তুত হয়; এই জন্য সংস্কৃত ভাষায় উহাকে খদির-সার কহে। ঘনচতুষ্কোণ, বিস্তৃতগোল প্রভৃতি নানা আকারের খদির বাজারে কিনিতে পাওয়াযায়। তন্মধ্যে পাপড়িখএর নামক ঘন চতুষ্কোণ খদিরই তাম্বূলের সহিত অধিক ব্যবহৃতহয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রদেশে ও সন্নিহিত কতিপয় দ্বীপে একপ্রকার গুবাক জন্মে, তাহা হইতেও খদির প্রস্তুত হয়। ঐ সকল গুবাককে খণ্ড খণ্ড কাটিয়া মৃৎপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে সোরা-মিশ্রিত জল দিতে হয়। ঐ জলে খদিরবৃক্ষের কতকগুলি ছাল নিক্ষেপপূর্ব্বক অগ্নির উপর চড়াইয়া জ্বালদিলে পর তাহাই ঘন হইয়া খদির প্রস্তুত হয়।

আমাদিগের বৈদ্যক শাস্ত্রানুসারে খদির শীতল, পাচন ও পিত্ত কফ কাশ বেদনা প্রভৃতি নানা রোগের মহৌষধ। ডাক্তারদিগের মতেও খদিরসেবনের দ্বারা শরীরের অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ চর্ম্ম সঙ্কুচিত হয়, তজ্জন্য উদরাময়াদি রোগে ইহা ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পান চূণ সুপারি প্রভৃতির সহিত শুষ্ক খদির ব্যবহার করে, তদ্ভিন্ন খদিরের সহিত ধনিয়া এলাইচ কর্পূর প্রভৃতি মসলা সকল মিশ্রিত করিয়া উহা কেতকী-পুষ্পের পত্রমধ্যে নিবদ্ধকরতঃ 'কেয়াখএর' প্রস্তুত করে। কেয়াখএর পূর্ব্বোক্ত মসলার সহিত মিশ্রিত ও

কেতকীপত্রদ্বারা সুবাসিত হওয়াতে তাম্বুলের এক উত্তম উপকরণ হয়। আমাদের স্ত্রীলোকেরা ছাঁচে ঢালিয়া খএরের বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ মনোহর দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া কুটুম্ব স্বজনের বাটীতে তত্ত্ব পাঠাইয়া থাকেন। লৌহ পাত্রস্থ আমলার জলে খদির গুলিয়া, তাহা বহুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া, সোহাগার খৈ দিয়া ভালরূপে মর্দ্দন করিয়া, লইলে উত্তম কালী প্রস্তুত হয়। এই কালী ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা পুস্তক লিখিতে সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। গো মেষাদির চর্ম্ম সকলকে রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে খএরের জলদ্বারা উহাতে কষলাগান হইয়াথাকে। আমাদের দেশহইতে যে সকল তুলা অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়, তাহার বস্তার উপরি-ভাগে খএরের জলদ্বারা পিঙ্গলবর্ণ চিহ্নসকল প্রদত্ত হয়। আমরাও সচরাচর খদিরের দ্বারা লেপ ও বালিশের খোল প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়াথাকি। সম্প্রতি প্রায় সর্ব্বত্রই ছিটের রঙে খদির অত্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে। ইউরো-পীয়েরা খদিরের সহিত অন্যান্য বস্তু মিশ্রিত করিয়া পীত, লোহিত, কপিশ প্রভৃতি নানাবিধ পাকা রঙ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এলাইচ।

এলা অর্থাৎ এলাইচ অতি সুগন্ধি পদার্থ। ইহার শিম্বী অর্থাৎ শুঁটী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজসকল সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবে। কটু-তিক্ত-মিশ্রিত ইহার একপ্রকার অপূর্ব্ব আস্বাদ আছে। আমরা ঐ আস্বাদ ও

সৌরভের জন্যই উহা ব্যবহার করি না; উহা আমাদের শরীরের পক্ষে নানারূপে উপকারক হয়।

লঙ্কা, মাদাগাস্কার দ্বীপ, মালাবার উপকুল প্রভৃতি ভারতবর্ষের সাগরতীরবর্ত্তী অনেকস্থানে আদাগাছের সজাতীয় একপ্রকার গুল্ম জন্মে। উক্ত গুল্মের পত্র পুষ্প উভয়ই বিলক্ষণ সুরভি। ঐ পুষ্প হইতে এক একটী পৃথক্ পৃথক্ অথবা স্তবকে স্তবকে যেসকল শিম্বী জন্মে, তাহাই এলাইচ। শিম্বীর অভ্যন্তরে দুই তিন স্তর ত্বকের নিম্নভাগে ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট বীজ অর্থাৎ দানাসকল প্রাপ্ত হওয়াযায়। বাঙ্গালা দেশের অনেক ধনাঢ্য লোকে আপন আপন উদ্যানে এলা রোপণ করিয়াছেন; উহাতে পুষ্প পর্য্যন্ত হয়—ফল হইতে দেখাযায়নাই। অতএব বোধ হইতেছে এদেশের জলবায়ু উহার পক্ষে হিতকর নহে।

এলাইচ দুইপ্রকার দেখিতে পাওয়াযায়—একপ্রকার স্থূল অর্থাৎ বড় এলাইচ এবং অপরপ্রকার ক্ষুদ্র অর্থাৎ ছোট এলাইচ। বড় এলাইচের ত্বক্ পিঙ্গলবর্ণ ও বীজ কৃষ্ণবর্ণ; ছোট এলাইচের ত্বক্ ধূসরবর্ণ ও বীজ অপেক্ষাকৃত কম কৃষ্ণবর্ণ হয়। প্রথমের অভ্যন্তরে সচরাচর ৫০টা বীজ ও দ্বিতীয়ের ১০টা বীজ পাওয়া যায়। এলাইচের গাছ মূল হইতে জন্মে, বীজ হইতে নহে। ছোট এলাইচকে সচরাচর গুজরাটী এলাইচ বলিয়াথাকে; ইহা স্তবকে স্তবকে জন্মে এবং মালাবার দেশই ইহার উৎপত্তি স্থান। উক্ত উভয় প্রকার এলাইচের, আকারের ন্যায় গুণেরও অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। গন্ধ অধিকতর তীব্র বলিয়া লোকে বড় এলাইচ অপেক্ষা ছোট এলাইচের অধিক সমাদর করিয়াথাকে।

এলাইচ আমরা পানের সহিত ভক্ষণ করি এবং সৌরভ ও স্বাদুতাসম্পাদনের জন্য আহারীয় ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রিত করিয়াথাকি। ইহা উত্তেজক, পুষ্টিকর, আগ্নেয় ও বমনপ্রতিবন্ধক পদার্থ। এলাইচ কীটনাশক, এই জন্য অনেক ঔষধের সহিত এলাইচ মিশ্রিত রাখে, তাহাতে সেই সেই ঔষধ শীঘ্র নষ্ট হয় না। এই গুণ থাকাতে এলাইচকে 'পরিরক্ষক' পদার্থ বলাযায়। এলাইচ চোয়াইয়া একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাও অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

লবঙ্গ।

এলাইচের ন্যায় লবঙ্গও তাম্বূল ও ব্যঞ্জনের এক প্রকার মসলা। লবঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ, স্বাদু, কটু ও সুগন্ধি বস্তু। লবঙ্গ একপ্রকার পুষ্পমুকুল; ইহার নিম্নভাগটী বৃন্ত ও উপরিভাগটী পুষ্পদল।

ভারতবর্ষস্থ মলবার উপকূলে ও মলক্কসপুঞ্জে, মরিসস্ ও বোর্ণোদ্বীপে এবং আমেরিকার সন্নিহিত কএকটী দ্বীপে অনতি ক্ষুদ্র একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। বসন্ত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রচুর পরিমাণে ঐ বৃক্ষে স্তবকে স্তবকে পুষ্প হয়। পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ যখন উহার বৃন্তের উপরিভাগস্থ চারিটী সূচী বহির্গত হয় এবং দলসকল
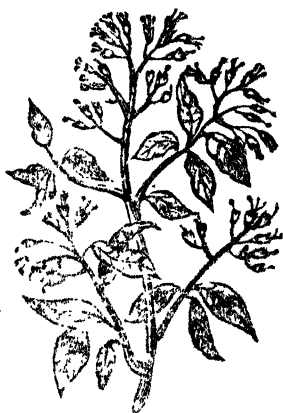
সপুষ্প লবঙ্গশাখা।

উপর্য্যুপরিভাবে অবস্থিত হইয়া ক্ষুদ্র মটোরের ন্যায় হইয়া গোলাকার ধারণ করে—সেই সময়ে পুষ্পসকল পাড়িয়া ফেলে। অনন্তর ২।১ দিন তাহাতে কাষ্ঠের ধূম প্রদান করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত লবঙ্গ প্রস্তুত হয়।

লবঙ্গের কিঞ্চিৎ বিরেচনশক্তি আছে; এ নিমিত্ত ৫।৬টা লবঙ্গের বৃন্ত প্রদীপের শিখায় দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। রোগে চক্ষু দিয়া জল পড়িলে ঐ চক্ষুতে মধুর সহিত লবঙ্গবৃন্ত ঘষিয়া দিলে ঐ রোগের অনেক নিবৃত্তি হয়। পিপাসার সময়ে লবঙ্গ মুখে রাখিলে কিয়ৎক্ষণের জন্য মুখশোষ কমিয়া যায়। লবঙ্গের পরিরক্ষণশক্তি আছে, এজন্য লবঙ্গচূর্ণ বা লবঙ্গক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে অপরাপর ঔষধসকল শীঘ্র নষ্ট হয় না। লবঙ্গভক্ষণে পরিপাক-শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং উদরাধ্মান, শূল প্রভৃতি রোগে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। লবঙ্গ হইতে একপ্রকার তৈলও প্রস্তুত হইয়াথাকে।

জয়িত্রী ও জায়ফল।

জয়িত্রী হরিদ্রাভরক্তবর্ণ, স্বাদু ও সুগন্ধি বস্তু। ইহাকে দেখিলে বৃক্ষত্বক্ বা সেইরূপ অন্য কিছু বলিয়া বোধ হয়। ইহা যে, ফুলের অভ্যন্তরে জন্মে, তাহা সহসা বুঝিতে পারা যায় না।

বঙ্গদেশে ও মলক্কস, জাবা, সুমাত্রা, শিঙ্গাপুর, পিনাঙ্, বোর্ণা, মরিসস্ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকার কতিপয় স্থানে একপ্রকার বৃহদাকার বৃক্ষ জন্মে। ঐ

বৃক্ষের ফলেই জয়িত্রী ও জায়ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলসকল আকারে প্রায় আম্ড়ার মত। পক্ব হইলে উহার উপরিভাগের ত্বক্ স্বয়ং ফাটিয়াযায়। ঐ ফাটা ফলসকল সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরিস্থ পুরু কোমল খোলাগুলি ফেলিয়া দিলেই ভিতর হইতে জালের মত জটিল যে পাতলাপদার্থ পাওয়া যায়, তাহাই জয়িত্রী বা জাতিপত্রী।

জায়ফল বৃক্ষ।

জয়িত্রীও এলাইচ এবং লবঙ্গের ন্যায় তাম্বূল ও ব্যঞ্জনের একপ্রকার মসলা। ইহাও এক পরিরক্ষক বস্তু। তদ্ভিন্ন ইহা অনেক ঔষধের কার্য্যও করিয়া থাকে। ইহা ভক্ষণ করিলে আপাততঃ পিপাসানিবারণ ও মুখবৈজাত্যের উপশম হয়।

পূর্ব্বোক্তফল হইতে ছুরিকাদ্বারা জয়িত্রী খুলিয়া লইলে তাহার নিম্নভাগে একপ্রকার কঠিন আঁঠী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আঁঠীতে ২।৪ দিন রৌদ্র ও অগ্নির উত্তাপ লাগাইতে হয়। তৎপরে যখন অভ্যন্তরস্থ বীজটী শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরে নড়িতে থাকে—তখন ঐ আঁঠী ভগ্ন করিলে তন্মধ্যে সূক্ষ্মচর্ম্মবৎ পদার্থবিশেষেরদ্বারা জড়িত আমের আঁঠীর ন্যায় যে শস্যটী নির্গত হয়, তাহাই জায়ফল বা জাতিফল।

পূর্ব্বে জয়িত্রীর যে যে গুণ উল্লিখিত হইল, জায়ফলেরও তাহাই আছে। তদ্ভিন্ন জায়ফল হইতে অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়, তাহাও অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হইয়াথাকে।

বৎসরের মধ্যে তিনবার অর্থাৎ বৈশাখ, ভাদ্র ও পৌষ মাসে জাতিবৃক্ষের ফল হইয়াথাকে।

দারুচিনি।

দারুচিনি পাটলবর্ণ, সুগন্ধি, মধুর এবং শুষ্ক ও সঙ্কুচিত পদার্থ। এলাইচ লবঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় শুষ্ক অবস্থায় ইহার গন্ধ অধিক পাওয়া যায় না, চর্ব্বণ বা মর্দ্দন করিলে ইহাহইতে মনোরম গন্ধ বাহির হইতে থাকে।

সুমাত্রা জাবা লঙ্কা প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় কতিপয় দ্বীপে ১০ | ১২ হাত উচ্চ একপ্রকার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ঐ বৃক্ষের অন্তস্ত্বক্ই দারুচিনি বা দারুত্বক্। বৃক্ষগুলি দেখিতে বিলক্ষণ সুদৃশ্য হয়। তিন বৎসরের বৃক্ষ হইলেই তাহা হইতে উৎকৃষ্ট দারুচিনি পাওয়া যায়; বৃক্ষ অধিক দিনের প্রাচীন হইলে তাহাহইতে দারুচিনি পাওয়া যায় না। বৎসরের মধ্যে দুইবার দারুচিনি সংগৃহীত হয়;—

দারুচিনি শাখা।

একবার বৈশাখ হইতে ভাদ্রের মধ্যে, দ্বিতীয়বার কার্ত্তিক হইতে মাঘের মধ্যে। দারুচিনি সংগ্রহ করিবার রীতি এই যে, প্রথমতঃ উপযুক্ত বৃক্ষসকল মনোনীত করিয়া তাহার শাখাসকল ছেদন করিতে হয়। ঐ শাখার উপরিস্থ ছালগুলি খুলিয়া ফেলিয়া অভ্যন্তরস্থ ছাল গুলিকে ছুরিদ্বারা লম্বালম্বি চিরিয়া দিতে হয়। অনন্তর ঐ ছালসকল যত্ন সহকারে তুলিয়া লইয়া, বড়গুলির মধ্যে ক্ষুদ্রগুলি, স্থাপনপূর্ব্বক রৌদ্রে দিতে হয়। কয়েকদিন রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ছালসকল গুটাইয়া পেন কলমের ন্যায় গোলাকার ধারণ করে। অনন্তর উহাদিগকে উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বাছিয়া বিক্রয়ার্থ স্থানে স্থানে প্রেরণ করে। উৎকৃষ্ট দারুচিনি কাগজের মত পাতলা হয় এবং তাহার একপ্রকার বিশেষরূপ স্বাদ ও গন্ধ আছে। উহা খাইলে জিহ্বা জ্বালা করে না, অথচ মুখ একপ্রকার মিষ্টস্বাদ হয়।

দারুচিনি তাম্বূল ও ব্যঞ্জনের একপ্রকার মসলা। ঔষধের পরিরক্ষণকার্য্যেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কটুতা মধুরতা উগ্রতা প্রভৃতি গুণ থাকাতে ইহা নিজেই অথবা অন্যান্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অনেক ঔষধের কার্য্য করে। দারুচিনি চোওয়াইয়া একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কর্পূর।

কর্পূর আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার গন্ধ অতি মনোহর, এইজন্য পানীয়জল, তাম্বূল ও অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইহা খাওয়া গিয়া থাকে। কর্পূর ঈষৎতিক্ত। চিকিৎসকেরা কর্পূরের দ্বারা অনেক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কর্পূরের গন্ধে অন্য দুর্গন্ধ নিবারিত হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সকল মরিয়া যায়। কর্পূর মাথায় মাখিলে উকুন থাকিতে পারে না এবং পুস্তকের পত্রে ঘষিয়া রাখিলে তাহাতে পোকা ধরে না।

কর্পূর দেখিতে শুভ্রবর্ণ ও উজ্জ্বল। অন্যান্য অনেক বস্তু অপেক্ষা কর্পূর লঘু; বাতাস লাগিলে ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুসকল ক্রমে ক্রমে খসিয়া অতি শীঘ্রই উড়িয়া যায়। কর্পূর এইরূপ উদ্বায়ী বলিয়া লোকে উহাকে সর্ব্বদাই ঢাকিয়ারাখে, বাতাসে রাখিতে দেয় না। কর্পূর উড়িবে না, এই জন্য অনেকে কর্পূরের সহিত গোলমরিচ মিশ্রিত করিয়া রাখে কিন্তু উহা ভ্রমমাত্র। বাতাস লাগিলে মরিচ থাকিলেও কর্পূর উড়িয়া যাইবে, মরিচ তাহাকে কোনপ্রকারেই ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

কর্পূর জলের সহিত মিশ্রিত হয় না। জলের উপর ভাসিয়া থাকে। কেবল তৈল ও সুরার সহিত মিশ্রিত হয়। অতি অল্পমাত্র অগ্নি লাগিলেই কর্পূর জ্বলিয়া উঠে; জ্বলন্ত কর্পূর জলে ফেলিয়া দিলেও নির্ব্বাণ হয় না—জ্বলিতে থাকে। কর্পূরের আলোক শুভ্রবর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর।

কর্পূর বৃক্ষ।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, কর্পূর একপ্রকার তৈল। সুমাত্রা, বোর্ণিও ও জাপান নামক দ্বীপে বৃহদাকার একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে। তাহারই অন্তর্গত তৈলবৎ পদার্থবিশেষ দ্বারা কর্পূর প্রস্তুত হয়। উক্ত বৃক্ষ সকল প্রাচীন হইলে তাহার অভ্যন্তর হইতে ঘনতৈলের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ বহির্গত হইয়াথাকে। উহা ছুরিকাদ্বারা চাঁচিয়া লইলেই কর্পূর প্রস্তুত হয়।

আমরা সচরাচর যে কর্পূর ব্যবহার করিয়া থাকি, উহা জাপানদেশীয় বৃক্ষহইতে জাত। উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ।—উক্ত বৃক্ষ সকলের মূল, স্কন্ধ প্রভৃতি সমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হয়। গলাসক একটা লৌহপাত্রে জল দিয়া তন্মধ্যে ঐ খণ্ড সকল ফেলিয়া দিতে হয়। একটা মৃৎপিণ্ড উক্ত পাত্রের মুখভাগে এরূপে বদ্ধ থাকে যে, পাত্রমধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। উক্ত মৃৎপিণ্ডের যে দিক্ ভিতরে থাকে, সেই দিকে তাহাতে কতকগুলি খড় বিদ্ধ থাকে। অনন্তর ঐ পাত্রের নীচে অতিশয় অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে কর্পূর, বাষ্পাকারে উড়িয়া খড়ে লাগিয়া জমাট বাঁধিয়া যায়।

হিমসিম নামে যে আর এক প্রকার কর্পূর আছে, তাহা সামান্য কর্পূর অপেক্ষা সাতিশয় উৎকৃষ্ট এবং তাহার মূল্যও ইহা অপেক্ষা প্রায় শত গুণ অধিক। এই কর্পূর চীনদেশীয় লোকেরা আদরপূর্ব্বক সচরাচর ব্যবহার করিয়াথাকে। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী কিঞ্চিদ্বিভিন্ন।—সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপে যে সকল কর্পূরবৃক্ষ জন্মে, তাহাদিগের কাষ্ঠসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া জলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপপূর্ব্বক তলায় জ্বাল দিতে হয় এবং একটা হাতারদ্বারা ঐ জল অনবরত নাড়িতে হয়। যখন ঐ হাতাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্পূর লাগিতে থাকে, তখন জল ছাঁকিয়া স্থির করিয়া রাখিলে তাহার উপরিভাগে কর্পূর জমিয়া ভাসিয়া উঠে। অনন্তর একটা তামার পাত্রে পরিষ্কৃত ধূলি ও কর্পূরচূর্ণ এই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করিয়া পাত্র পরিপূর্ণ করত তাহার উপরিভাগে ঐরূপ আর একটী শূন্যপাত্র চাপা দিতে হয়। ঐ উভয়পাত্রের সন্ধিস্থলে উত্তমরূপে লেপ দিয়া নিম্নে উত্তাপ দিলেই ঐ কর্পূর শূন্যপাত্র মধ্যে উত্থিত হইয়া জমাট হইয়া যায়। ঐ কর্পূরকেই হিমসিম কর্পূর কহে।

কর্পূর বহুকাল অবধি আরবদেশে ও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। আরবদেশে উহার নাম কাম্ফর বা কাপ্ফর। যাহা হউক, আরবেরাই কর্পূরের অপভ্রংশ হইতে ঐ নাম প্রস্তুত করিয়াছে অথবা আমরাই আরবীয় নাম হইতে কর্পূর নাম রচনা করিয়াছি, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিশির—বরফ।

শীতকালে প্রভাত সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলে, অনাবৃত তৃণক্ষেত্রের উপরিভাগে মুক্তাকলাপের ন্যায় শিশিরবিন্দুসকল পতিত রহিয়াছে, দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ঐ শিশির যে কিরূপে জন্মে, তাহা অনেকের জানা নাই। কাহারও বোধ আছে যে, উহা বৃষ্টির ন্যায় নভোমণ্ডল হইতে পতিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা যেরূপে উৎপন্ন হয়, নিম্নভাগে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

সূর্য্যের প্রখর কিরণদ্বারা পৃথিবীর জলভাগ সকল বাষ্পের আকার ধারণকরিয়া উত্থিত হয়। ঐ বাষ্প কতক মেঘ হয় ও কতক অদৃশ্যভাবে বায়ুর সহিত মিলিত হয়। এদিকে পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুই দিবাভাগে সূর্য্যের যে তাপ গ্রহণ করে, রজনীতে তাহা বিকরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। তাপবিকরণ করিতে কোন বস্তুর অল্পক্ষণ কোন বস্তুর অধিকক্ষণ আবশ্যক হয়। যাহা হউক, যে বস্তু শীঘ্রই তাপবিকরণ করিয়া অধিক শীতল হয়, তাহাতে ঐ বাষ্পমিশ্রিত বায়ু লাগিবামাত্র উক্ত বাষ্প ঘমিয়া জল হইয়া উহার গাত্রে লাগিয়াথাকে। উহাকেই আমরা শিশির বলি। অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা তৃণ, পত্র, কেশ, কাচ প্রভৃতি দ্রব্যে যে, অধিক শিশির দৃষ্ট হয়, উক্ত তৃণাদির আশুবিকরণ-কারিতাই তাহার মূল কারণ।

শিশির সর্ব্বকালেই জন্মিতে পারে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বস্তুসকল তাদৃশ বৃহৎদিবাভাগে প্রাপ্ত তাপ সকল বিকরণ করিয়া অধিক শীতল হইতে না হইতেই পুনর্ব্বার সূর্য্যের উদয় হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে শিশির অধিক জন্মিতে পায় না। শীতকালেও যে রাত্রি মেঘাবৃত থাকে, তাহাতে শিশির উৎপন্ন হয় না। তাহার কারণ এই যে, বিকীর্ণ তাপসকল মেঘমণ্ডলীতে প্রতিহত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আইসে, সুতরাং তৎকালে কোন বস্তুই উপযুক্তরূপ শীতল হয় না।

সূর্য্যের তাপকে অন্যান্য বস্তু যেরূপ গ্রহণ করে, বায়ুও সেইরূপ করিয়াথাকে। সুতরাং উহাও স্বকীয় তাপ সকল বিকরণ করিয়া শীতল হইলে তৎসংযুক্ত বাষ্পরাশি উপরিভাগেই যমিয়া বিন্দু বিন্দু আকারে পতিত হয়। কুজ্ঝটিকা এইরূপেই হইয়াথাকে।

উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতশিখরসকল যে, তুষারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহার কারণ এই যে, তথাকার বায়ু সতত সাতিশয় শীতলই থাকে, সুতরাং তথায় মেঘ বা বায়ুসহকৃত বাষ্প যাইবামাত্র যমিয়া শুক্লবর্ণ তুষার বর্ষণ করে। ঐ সকল তুষার স্তরে স্তরে পড়িলেই গাঢ় হইয়া বরফের আকারে পরিণত হয়। ইঙ্গলণ্ড, স্কটলণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি হিমপ্রধান জনপদে শীতকালে সর্ব্বদাই এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তত্রত্য লোকেরা অট্টালিকার উপরিভাগের ছাদসকল সমতল না করিয়া অস্মদ্দেশীয় গৃহের চালের ন্যায় ঢালু করিয়া থাকে। সমতল করিলে সতত তুষারপাত হওয়াতে উক্ত ছাদসকল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহে সূর্য্যের তাপ এত অল্প যে, তথার শীতকালের রজনীতে নদী সরোবর প্রভৃতি জলাশয় সকল যমিয়া বরফ হইয়া যায়। উক্ত সরোবরাদি যখন যমিয়া বরফময় হয়, তখন কাষ্ঠময় পাদুকাসহকারে তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করিতে পারাযায়। কিন্তু এই ব্যাপার উষ্ণ-প্রধান দেশীয় লোকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে।

জল হইতে তাপ সকল বিনির্গত হইয়া যখন তাপমানের বত্রিশ অংশের অধিক না থাকে, তখন সেই জল যমিয়া বরফ হয়। এদেশ এমন উষ্ণ যে, এখানে স্বভাবতঃ সেইরূপ হইবার কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখানেও কৌশলপূর্ব্বক জলকে ঐরূপ শীতল করিয়া বরফ প্রস্তুত করিয়া থাকে।—গৃহ ও বৃক্ষাদির অসন্নিহিত অনাবৃত ভূমিভাগে একহস্ত গভীর চৌকা কাটিয়া তন্মধ্যে তুষ খড় বা তাদৃশ অন্য কোন অপরিচালক বস্তু ঘনরূপে পাতিত করে; যে দিন অতিশয় শীত, সেই দিন প্রদোষ সময়ে রঙ না দেওয়া মৃণ্ময় অগভীর শরাবসকল জলপূর্ণ করিয়া তদুপরি পাতিয়া রাখে। গর্ত্তের অভ্যন্তরে যে সকল তৃণাদি থাকে, তাহারা অতিশীঘ্রই স্ব স্ব তাপ বিকরণ করিয়া শীতল হয় এবং উহাদিগের অপরিচালকতা প্রভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তাপ সকল নির্গত হইয়া শরাবে লাগিতে পায় না, শরাবে রঙ্ দেওয়া না থাকাতে,উহা সচ্ছিদ্র হয়; সুতরাং ঐ ছিদ্র দিয়া শরাবস্থ জলের কিয়দংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। অবশিষ্টভাগ বাহ্য বায়ুতে স্বকীয় তাপ সকল বিকরণ করত শীঘ্রই উপযুক্তরূপে শীতল হইয়া যমিয়া কঠিন হয়। ইহাকে বরফ কহে। বরফ

দেখিতে শুভ্রবর্ণ। অল্পমাত্র তাপ লাগিলেই বরফ গলিয়া যায়। এই জন্য লোকেরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উক্ত বরফসকল একত্র করত খড় বা কম্বল দিয়া বদ্ধ করিয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেয়।

অতিশয় শীতলতাজন্য বরফ অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বিকারের রোগীর রক্তসকল যখন উষ্ণ হইয়া মস্তকের উপর উঠে, তখন ঐ রক্ত শীতল করিবার জন্য ডাক্তরেরা মাথায় বরফ বসাইয়াথাকেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়ে বরফের জল পান করিলে বা গাত্রে মাখিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। বরফ এত শীতল যে তাহার সংযোগে অন্যান্য তরল পদার্থও জমাট হইয়াযায়। এই নিমিত্ত লোকেরা দুগ্ধ, লেবুর রস প্রভৃতি তরল দ্রব্য সকল টিনের নলের অভ্যন্তরস্থ করিয়া তাহার দুই মুখ বদ্ধ করে, অনন্তর উহার উপরিভাগে কিঞ্চিৎ লবণ ও বরফ দিয়া খড় বা কম্বলদ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া রাখে। ইহাতেই চোঙার মধ্যস্থ দুগ্ধাদি যমিয়া কঠিন হইয়াযায়। ইহাকেই কুল্পি বলে।

বরফ যেরূপ শীতল, বৃষ্টিকালে কখন কখন যে করকা নিপতিত হয়, তাহাও সেইরূপ। কিন্তু করকা কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ অদ্যাপি স্থিররূপে নির্ণীত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, বৃষ্টিকালীন জলসকল উপরিভাগেই শীতল বায়ুসংযোগে কঠিন হইয়া করকা উৎপাদন করে।

চীনাবাসন।

দোয়াৎ পেয়ালা বাটী গেলাস প্রভৃতি নানা প্রকার চীনাবাসন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কাচপাত্রে অম্লাদি দ্রব্য রাখিলে যেরূপ অবিকৃত থাকে, চীনাবাসনেও সেইরূপ থাকে; এই নিমিত্ত অনেক দেশে চীনাবাসন গৃহকার্য্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়াথাকে।

শ্বেতবর্ণ একপ্রকার কাদা ও অগ্নি-প্রস্তর ইহাই চীনাবাসনের প্রধান উপাদান। ঐ কাদা চীন ইঙ্গলণ্ড সাক্‌সনি প্রভৃতি নানা দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনেরা উহাকে 'কেওলিন' কহে। প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর সকলকে দগ্ধ করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করত চালনী দ্বারা চালিয়া উক্ত কর্দ্দমের সহিত বিলক্ষণরূপে মিশ্রিত করে। অনন্তর যখন উহা গঠনের উপযুক্ত হয়, তখন তাহার কিয়দংশ লইয়া, কুম্ভকারদিগের হাঁড়ি গড়িবার যেরূপ চক্র থাকে, সেইরূপ ঘূর্ণমান চক্রের উপরিভাগে রাখিয়া হস্তদ্বারা অভ্যাসবশতঃ অতি শীঘ্রই নানাবিধ গোলাকার বস্তু গড়িয়া থাকে। যদি উহার উপরিভাগে দাগ দিয়া কিছু লিখিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে পাত্র কাঁচা থাকিতেই তাহা সম্পন্ন করিয়া লয়। অনন্তর উহারা কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে পর পোয়ানে চড়াইয়া অল্প অল্প জ্বালে ২ | ৩ দিন পোড়াইতে হয়। পাছে মলিন হয়, এই জন্য এই সময়ে উহাদিগের গাত্রে কাদার লেপ দিয়া রাখে। অনন্তর অগ্নিকে ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ করিয়া পাত্র সকল বাহির করত উপরি-

ভাগের লেপ খুলিয়া ফেলে। তখন উহারা বিলক্ষণ শুভ্রবর্ণ ও অতিশয় সচ্ছিদ্র থাকে। এই সময়েই ঐ পাত্রে রঙ দেয়। উক্ত রঙ সকল নানাবিধ ধাতুর মরিচা ও সফেদা লবণ প্রভৃতি দ্বারাই প্রস্তুত হয়।

এপর্য্যন্ত যাহা হইল, তাহাতে বাসন সকল অতিশয় মেড়্‌মেড়ে থাকে। পরে উহাদিগকে চাক্‌চক্যশালী করিবার নিমিত্ত একপ্রকার তরল পদার্থে ডুবাইয়া রাখে। ঐ পদার্থ সচরাচর লবণ ও সফেদা দ্বারাই প্রস্তুত হয়। অনন্তর উহাদিগকে পুনর্ব্বার দেড় দিন পর্য্যন্ত পোড়াইয়া থাকে। ইহাতে বাসনের উপরিভাগ সকল কাচের ন্যায় চাক্‌চক্যশালী হইয়া উঠে। যদি ঐ পাত্রের উপরিভাগে পুনর্ব্বার অন্যবিধ রঙ দিবার অথবা সোণার পাত দ্বারা গিল্ট করিবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে এই সময়েই তাহা সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিতে পোড়াইতে হয়। বাসনের উপরিভাগে যে সকল রঙ প্রদত্ত হয়, তাহা দগ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিভিন্ন হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট চীনাবাসন সকল সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণ ও সাতিশয় চাক্‌চক্যশালী হয়। উহা এরূপ কঠিন হয় যে, ইস্পাতে ঘর্ষণ করিলে উহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াথাকে। পাতলা উৎকৃষ্ট চীনাবাসনে আঘাত করিলে ধাতুর ন্যায় শব্দ বাহির হয়। প্রস্তরচূর্ণ মৃত্তিকা ও উজ্জ্বলতা-জনক তরলপদার্থ ইহাদিগের তারতম্যানুসারে উক্ত পাত্র সকলেরও বিভিন্নতা হইয়াথাকে।

উক্ত বাসন সকল সর্ব্ব প্রথমে কেবল চীন দেশেই প্রস্তুত হইত, এই নিমিত্ত উহাদিগকে সচরাচর চীনাবাসন

কহা গিয়াথাকে। কিন্তু এক্ষণে ইঙ্গলণ্ড, ফ্রান্স, সাক্সনি প্রভৃতি নানাদেশে এইরূপ উত্তম উত্তম বাসন সকল প্রস্তুত হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল আমাদিগের দেশে কাহলগাঁর নিকটেও চীনাবাসন প্রস্তুত হইতেছে।

সাবান।

'সাবান মাত্রই কেবল গো-বসা দ্বারা নির্ম্মিত' এই বোধে অস্মদ্দেশীয় জনগণ সাবানকে অতিশয় অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়াথাকেন। বস্তুগত্যা, সাবান পশ্বাদির চর্ব্বিদ্বারাও প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু কোন কোন সাবান চর্ব্বির পরিবর্ত্তে কেবল তৈলদ্বারা প্রস্তুত হয়। ফলতঃ কোন কোন সাবানে চর্ব্বি থাকে, এই জন্য যাঁহারা সাবানমাত্রকেই অপবিত্র বোধ করেন, কোন কোন মমবাতিতে চর্ব্বি আছে বলিয়া মমবাতি মাত্রকেই অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য্য বোধ না করা তাঁহাদিগের কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? ফলতঃ শরীর যত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে, ততই সুস্থ ও সবল হয়। সাবান গাত্রে মাখিলে শরীরের ক্লেদ সকল নির্গত হইয়াযায়। শরীরের ক্ষতস্থানে সাবান ঘর্ষণ করিলে ঐ ক্ষতভাগ শীঘ্র শুষ্ক হইয়াযায়। বিশেষতঃ পাঁচড়া, চুলকোনা প্রভৃতি রোগে সাবানের জল দিয়া উত্তমরূপে গাত্র ধৌত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; অতএব এতাদৃশ উপকারক বস্তুকে অব্যবহার্য্য না রাখিয়া নিম্নলিখিতরূপে গৃহজাত সাবান প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে বোধ

হয়, কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ—

শাদা উত্তম সাজীমাটী, কলিচূণ ও নারিকেলতৈল ইহাদিগের সমান সমান অংশ একত্র করিয়া জল দিয়া গুলিতে হয়। অনন্তর ঐ গোলাকে অগ্নির উপর চড়াইয়া অনেকক্ষণপর্য্যন্ত ফুটাইতে হয়। ফুটাইবার সময়ে হাতাদ্বারা উহাকে অনবরত নাড়িয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া একপ্রকার আঠার ন্যায় হইয়াউঠে। কিন্তু তখনও উহাতে কিঞ্চিৎ জলভাগ থাকে। ঐ জল পৃথক করিতে হইলে উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া দেয়। লবণ দ্রবীভূত ও জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়ে, সুতরাং ঘন পদার্থটা উপরিভাগে ভাসিয়াথাকে। তখন উহাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া শীতল করিলেই বিলক্ষণ গাঢ় হইয়া উঠে, এবং উহাকেই সাবান কহে। উষ্ণোষ্ণ সাবানকে ছাঁচে ঢালিয়া বিবিধাকার করা যাইতে পারে। যদি সাবানকে রঞ্জিত করিবার ইচ্ছা হয়, তবে যখন উহা অতিশয় উষ্ণ থাকে, তখন যে রঙ ইচ্ছা, উহাতে সেই রঙই দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঐ রঙ হরিতালাদি কোন প্রকার বিষাক্ত না হওয়া উচিত। সাবান শীতল করিবার সময়ে উহাতে মৃগনাভি আতর কর্পূর প্রভৃতি নানাবিধ গন্ধদ্রব্যও সংযুক্ত করা যাইতে পারে। সুগন্ধি সাবান অতি মনোরম পদার্থ।

ক্ষার, চূণ এবং তৈল বা চর্ব্বির তারতম্য অনুসারে সাবানেরও তারতম্য হইয়াথাকে। উৎকৃষ্ট সাবানের অতি অল্পমাত্র অংশ লইয়া জল দিয়া ঘর্ষণ করিলে

যত শুভ্রবর্ণ কেন উত্থিত হয়, অপকৃষ্ট সাবানে কখন সেরূপ হয় না। উহার গন্ধও অতিশয় বিশ্রী হয়।

নীলবড়ি।

নীলবড়ি উজ্জ্বল ও কঠিন। ইহা একপ্রকার উদ্ভিজ্জ-জাত পদার্থ। ইহার স্বনামপ্রসিদ্ধ বর্ণ গাঢ় মেঘের ন্যায়, —দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে গুঁড়াও করা যায়, জলের সহিত গোলাও যায়।

আমেরিকা ও ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ যশোহর, কৃষ্ণনগর, মুর্শীদাবাদ, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, ত্রিহুত, বারাণসী প্রভৃতি প্রদেশগুলিই নীল উৎপন্ন হইবার প্রধানস্থান।

ভূমিসকল উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া কার্ত্তিক অথবা ফাল্গুনমাসে (অথবা যদি ভাল বৃষ্টি হয় তবে বৈশাখ মাসেও) নীলের বীজ বপন করিয়াথাকে। নদীর চর বা তাদৃশ পলিমাটীযুক্ত ভূমিই নীল জন্মিবার উত্তমস্থান। চারাসকল ক্রমশঃ বড় হইয়া ২। ৩ হাত হইতে ৫। ৬ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়াথাকে। যখন ঐ চারার ফুল হয় এবং পাতাগুলি টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, তখন উহাদিগকে কাটিবার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করে। ফলতঃ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে অথবা বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে কাটিয়া ও বাণ্ডিল বাঁধিয়া কুঠিতে আনয়ন করে। তথায় কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে ইষ্টক-নির্ম্মিত কতকগুলি (সচরাচর ১২টী) চৌবাচ্চা থাকে। ঐ গুলির প্রত্যেকের আয়তন সচরাচর ১২ হাত দীর্ঘ ১২ হাত প্রস্থ ও ২ হাত উচ্চ হইয়াথাকে। এই চৌবাচ্চা-গুলিকে 'পাতিহাউজ' কহে। পাতিহাউজের অভ্য-

ন্তর ভাগ নীলগাছে পূর্ণ করিয়া উপরিভাগে কাষ্ঠ ও বাঁশের দ্বারা বিলক্ষণরূপে জাঁত দেয়। পরে জলের দ্বারা ঐ হাউজ পরিপূর্ণ করিয়া দিলে পাতাসমেত গাছ সকল জলের ভিতর থাকাতে পচিতে থাকে। এই ভাবে ১০।১২ ঘণ্টা কাল থাকিলে পর ঐ জল স্ফুরিত হইয়া বুদ্বুদ বাহির করিতে আরম্ভ করে। তখন উহার তলভাগস্থিত নালীর মুখ খুলিয়া দিলে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ সমুদয় জল, ঐ হাউজের পার্শ্বস্থ নিম্নস্থানবর্ত্তী অপর এক চৌবাচ্চার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই চৌবাচ্চার আকার কিছু লম্বা হয় এবং ইহাকে 'মন্থনী-হাউজ' কহে। মন্থনী হাউজে সমুদয় জল আসিয়া পৌঁছিলে পর ৭।৮ জন লোক তাহাতে নামিয়া বাঁশের হাতাদ্বারা ক্রমিক ২।৩ ঘণ্টা কাল মন্থন করিতে থাকে; তদ্দ্বারা জলের উপর অতিশয় ফেনা উদ্গত হয়। এইরূপ মন্থন করাকে 'নীলগাঁজা' কহে। ঐ মথিত জল কোন কাচপাত্রে স্থির করিয়া রাখিলে যখন উহার অভ্যন্তরে দানা বাঁধিতেছে দৃষ্ট হয়, তখন মন্থনকার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ বন্ধ রাখিলেই ফেনাসকল মরিয়া জল নীলবর্ণ হয়, পরে উহা বেশ স্থির হইলে উপরিভাগে শুদ্ধ জল ও নিম্নভাগে সার বসিয়াছে, দেখিতে পাওয়াযায়। অনন্তর ঐ হাউজের এক পার্শ্বে উপর্য্যুপরিভাবে যে ৮।৯টী নালী থাকে, উপরি হইতে ক্রমে ক্রমে তাহার এক একটী খুলিয়া দিলে স্থির জল সমুদয় নির্গত হইয়া গিয়া সারভাগমাত্র হাইজে অবশিষ্ট থাকে। ঐ সার ভাগে পুনর্ব্বার নূতন জল মিশ্রিত করিয়া নিম্নদেশস্থ

অপর এক নালীদ্বারা তৎসমুদয়কে অপর এক চৌবাচ্চায় লইয়া যাইতে হয়। এই চৌবাচ্চাকে বোমার চৌবাচ্চা বা 'বোমাহাউজ' কহে।

বোমার চৌবাচ্চার নিকটবর্ত্তী উচ্চস্থানের উপরিভাগে তাম্রের কটাহ বা তাওয়া থাকে। বোমা নামক যন্ত্রদ্বারা ঐ চৌবাচ্চাস্থিত জলমিশ্রিত নীল সকল উক্ত কটাহে উত্তোলিত হইলে নিম্ন হইতে জ্বাল দিতে হয়। ইহাকে 'নীলপোক্তান' কহে। কিয়ৎক্ষণ জ্বাল পাইয়া যখন উহা ফুটিতে থাকে, তখন ঐ কটাহের নিম্নদেশস্থ নালী খুলিয়া দিলে তৎসমুদয় অপর এক গৃহমধ্যে আসিতে থাকে। এই গৃহকে 'বালুমেজ' কহে।

বালুমেজের মধ্যভাগে কাষ্ঠের কড়ির উপর বাঁশের বাকারি সকল ঘনরূপে পাতিত করিয়া তদুপরি মোটা-চাদর বিছাইয়া দেয়। ঐ চাদরের উপর উষ্ণ নীল সকল পতিত হইয়া ১২ | ১৪ ঘণ্টা কাল অবস্থিত থাকে। এই কালের মধ্যে নীলের অভ্যন্তরস্থ জল সকল চাদরের মধ্যদিয়া নীচে পড়িয়া গেলে নীলগুলি কাদার মত দৃষ্ট হয়।

অনন্তর উহাদিগকে কাষ্ঠের বড় বড় ফর্ম্মার মধ্যে আস্তৃত বস্ত্রের উপর ফেলিয়া উপরি হইতে অপর এক কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা চাপ দিয়াথাকে। এই চাপ দেওয়াতে অভ্যন্তরস্থ সমুদয় জলভাগটা• নিঃশেষে নির্গত হইয়া গেলে নীলভাগটী যখন এরূপ কঠিন হয় যে, টিপিলে উহাতে অঙ্গুলি বসে না, তখন ফর্ম্মার কাষ্ঠগুলি খুলিয়া দিয়া পিত্তলের তারদ্বারা ঘন ৩ ইঞ্চি আকারে সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করে এবং প্রত্যেক খণ্ডের উপর

নম্বর ও অধিকারীর নাম প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তৎসমুদয় কোন বায়ুসঞ্চরিত গৃহমধ্যে উচ্চ স্থানের উপর শুষ্ক করিতে দেয়। ২।৩ মাস ব্যাপিয়া উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে পর উহাদিগকে বাক্স মধ্যে বদ্ধ করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে।

নীলবড়ী কোন কোন ঔষধেও লাগিয়াথাকে, কিন্তু রঙের কার্য্যেই ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নীলের নিজের রঙই অতি উৎকৃষ্ট, আবার ইহার সহিত অন্যান্য রঙ্ মিশ্রিত করিয়া নানাবিধ মনোহর মিশ্ররঙ্ প্রস্তুত করিয়াথাকে।

কুইনিন।

এক্ষণে ডাক্তরি চিকিৎসা অনেক স্থানে প্রচলিত হওয়াতে কুইনিনের নাম প্রায় সকলেরই শ্রুতি-গোচর হইয়াছে। কুইনিন চূর্ণ, শুভ্রবর্ণ, উজ্জ্বল ও অতিশয় তিক্ত। ইহা অপেক্ষা জ্বররোগের মহৌষধ এপর্য্যন্ত আর কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় চিকিৎসকেরা কুইনিন ব্যবহার করিতেন না। এক্ষণে তাঁহারাও অনেকে কুইনিনের মহোপ-কারিতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উহার প্রকৃতাবস্থা গোপন করিয়া উহাতে লাল কাল প্রভৃতি রঙ ও অন্যান্য সামান্য বস্তু মিশ্রিত করত• বটিকাকার করিয়া সচরাচর ব্যবহার করিয়াথাকেন। যে রোগী অধিক পরিমাণে কুইনিন খাইয়া রোগমুক্ত হয়, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার কাণ ভোঁ ভোঁ করে। অধিককাল উত্তমরূপে শুশ্রূষা না করিলে তাহার নিবৃত্তি হয় না।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী পেরু নামক দেশে সিঙ্কোনা নামে একপ্রকার দীর্ঘাকার বৃক্ষ জন্মে। তাহারই ত্বক্ হইতে কুইনিন প্রস্তুত হয়। কুইনিন প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ ত্বক্ সকলকে খণ্ড খণ্ড রূপে কাটিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয। এই জলে কিঞ্চিৎ গন্ধদ্রাবক মিশ্রিত করিয়া দেয। সিদ্ধ করিতে করিতে উহার পালো-ভাগটা দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হইয়াযায়। অনন্তর উহাতে এমোনিয়া ও অঙ্গার মিশ্রিত করত অনেক কৌশল পূর্ব্বক ঐ পালো-ভাগকে শুভ্রবর্ণ ও বহির্গত করিয়া লয় এবং তাহাকেই কুইনিন কহে।

যে ত্বক্ হইতে কুইনিন উৎপন্ন হয়, ইংরাজি ভাষায় তাহাকে 'পেরুভিয়ান বার্ক' কহে। ঐ বার্কে কুইনিনের ভাগ অতি অল্পই থাকে। শত তোলা উত্তম বার্ক হইতে তিন তোলা কুইনিন বহির্গত হয়। এই জন্য চিকিৎসকেরা যখন কুইনিনের অভাবে বার্ক প্রয়োগ করেন, তাহা তাদৃশ উপকারজনক হয় না।

কুইনিনের জ্বরহরতা-শক্তি পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিল না। ইহার প্রথম প্রকাশ বিষয়ে নানারূপ গল্প আছে। কেহ কহেন—পেরু দেশীয় কোন জ্বরাতুর রোগী একটী পুষ্করিণীর জল খাইয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছিল, তাহাতে অনুসন্ধানদ্বারা প্রকাশ হইল যে, ঐ জলে তীরজাত একপ্রকার বৃক্ষের শাখাপল্লবাদি সর্ব্বদাই পতিত থাকিত। অনন্তর ঐ বৃক্ষই জ্বর-রোগের ঔষধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অপরে কহিয়া থাকেন যে, ইউরোপীয়েরা ঐ বৃক্ষকে অতিশয় তিক্ত

দেখিয়া পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উহার ত্বগাদি এক জ্বররোগীকে খাওয়াইয়াছিলেন। অনন্তর উহাদ্বারাই তাহার রোগমোচন হইলে তাঁহারা ঐ বৃক্ষ হইতে জ্বররোগের ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তৈল।

তিল হইতে যে স্নেহ নির্গত হয়, বাস্তবিক তাহাকেই তৈল বলাযায়। কিন্তু এক্ষণে অন্যান্য দ্রব্যজাত ঐরূপ পদার্থ মাত্রই তৈলশব্দে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রায় সকল তৈলই ঈষৎ পীতবর্ণ, তরল, দীপ্য ও জল অপেক্ষা লঘু। তৈল আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের এক প্রধান উপযোগী পদার্থ। ইহা আমরা আহার করি, গাত্রে মর্দ্দন করি, অন্যান্য দ্রব্যে মাখাইয়া তাহার দুর্গন্ধ দূর করি ও জ্বালাইয়া অন্ধকার নিবারণ করি। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ রঙ ও শিল্পকার্য্যসমূহে যে, ইহার কত প্রয়োজন তাহার ইয়ত্তা করাযায় না।

তৈল নানাপ্রকার; তন্মধ্যে অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ হইতে, কতকগুলি প্রাণি-শরীর হইতে ও কতকগুলি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াথাকে। এস্থলে উক্ত ত্রিবিধ তৈলেরই সচরাচরপ্রচলিত কয়েকপ্রকার মাত্রের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

তিলতৈল—তিলের বীজ সকল শিম্বীর অভ্যন্তরে জন্মে। উহার আকার যেরূপ তাহা সকলেই অবগত আছেন। উহাদিগের বর্ণ দুইপ্রকার হয়, কৃষ্ণ ও শ্বেত। তিল সকল কিঞ্চিৎ জলসংযুক্ত করিয়া ঘানি যন্ত্রের

অভ্যন্তরে দিয়া পাক দিলেই উহারা পিষ্ট হইয়া এক দিক দিয়া কল্ক (খইল) এবং অপর দিক দিয়া তৈল নির্গত হইয়া পড়ে। তিল হইতে শতকরা ৪০ | ৪২ সের উত্তম তৈল নির্গত হয়। তিলতৈল অতিশয় স্নিগ্ধ, অন্যান্য তৈল অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ।

যাহাকে পুষ্প-বাসিত তৈল অর্থাৎ ফুলল্ তেল কহে, তাহা তিল হইতেই উৎপন্ন হয়। তিলের অতিশয় গন্ধগ্রাহিকা শক্তি আছে, অর্থাৎ উহা যে দ্রব্যের সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই দ্রব্যের গন্ধ অচিরাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিয়ালয়। এই নিমিত্ত লোকেরা কোন পাত্রের উপর তিল ছড়াইয়া তাহার উপরিভাগে গোলাব, মল্লিকা, জাতি বা অপরবিধ সুগন্ধি পুষ্পের দল সকল ছড়াইয়া, তদুপরি তিল ও তদুপরি পুষ্পদল এইরূপে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখে। ২ | ১ দিন পরে পর্য্যুষিত পুষ্পসকল বাহির করিয়া অভিনব পুষ্পদল পূর্ব্বোক্তরূপে বিন্যস্ত করে। এইরূপ কয়েক দিন করিলেই তিল সকল পুষ্পের গন্ধে সুবাসিত হইয়া অতিশয় সুগন্ধি হয়। তখন উহাকে মাড়িলে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাই ফুলল্ তেল। ফুলল্ তৈল অতিশয় স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি, কিন্তু অধিক কাল বাতাস পাইলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়।

অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসকেরা তিল-তৈলদ্বারা গুড়ুচি প্রভৃতি নানাবিধ পাকতৈল প্রস্তুত করিয়াথাকেন।

সর্ষপতৈল—সর্ষপেরও বীজ দুই প্রকার, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতসর্ষপ, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নিষ্পীড়ন করিলে শতকরা ৩৬, এবং কৃষ্ণসর্ষপ হইতে ২৮ | ২৯ অংশ তৈল প্রাপ্ত হওয়াযায়। সর্ষপতৈল ঈষৎ পীতবর্ণ ও কিঞ্চিৎ ঝাল। এই তৈলে গন্ধকের কিঞ্চিৎ অংশ আছে, এই জন্য

ইহা গাত্রে মাখিলে ব্রণ ও চুলকোনা সকল নষ্ট হয় এবং ক্ষতভাগের উপর দিয়া রাখিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়াযায়।

নারিকেলতৈল—এই তৈল দুইপ্রকার প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াথাকে। নারিকেলের শাঁস ছেঁচিলে যে দুগ্ধ নির্গত হয়, তাহা অগ্নিতে জ্বাল দিলে উহার উপরিভাগে তৈল উত্থিত হয়, এবং ঐ শাঁস সকল খণ্ড খণ্ড রূপে কাটিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করত ঘানি গাছে নিষ্পীড়ন করিলে একবারে উত্তম তৈল বহির্গত হয়। অন্যান্য তৈল অপেক্ষা এই তৈল অধিক স্বচ্ছ; ইহা অল্পমাত্র শীতল হইলেই যমিয়া ঘনীভূত হয়। এই তৈল অনেক ঔষধে লাগিয়াথাকে এবং মমের সহিত মিশ্রিত করিলে ইহাতে উত্তম বাতি ও শুকো মলম্ প্রস্তুত হয়।

এরণ্ড তৈল—এরণ্ড অর্থাৎ ভেরেণ্ডা বৃক্ষের বীজের শাঁসসকল নিষ্পীড়নকরিলে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে এরণ্ড-তৈল কহে। ইংরেজি ভাষায় ইহার নাম কাষ্টর-অইল। এই তৈল কিঞ্চিৎ গাঢ়। ইহা নানাপ্রকার ঔষধে লাগিয়াথাকে, বিশেষতঃ ইহাতে উত্তম জোলাপ হয়, তদ্ভিন্ন নানাবিধ শিল্পকার্য্যেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

মসিনাতৈল—তিসি বা মসিনা হইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে মসিনা-তৈল কহে। এই তৈলও কিঞ্চিৎ গাঢ়। রুসিয়া ও গ্রীন্‌লণ্ডনিবাসী লোকেরা অতি সুখাদ্য বলিয়া এই তৈল আহার করিয়াথাকে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই শিল্পকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়।

গর্জ্জনতৈল—চাট্‌গাঁ, পেগু, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি দেশসমূহে গর্জ্জননামে একপ্রকার প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মে, তাহারই গাত্র হইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে

গর্জ্জন-তৈল কহে। শীতকালে উক্ত বৃক্ষের গুড়ির একস্থানে চাঁচিয়া অগ্নিদ্বারা কিঞ্চিৎ দগ্ধ করত একটী ছিদ্র করিয়া দিলে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে ঐ তৈল নির্গত হয়। গর্জ্জনতৈলে একপ্রকার তীব্র গন্ধ আছে; ইহা কোন কোন ঔষধে ও শিল্পকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বোক্ত তিল সর্ষপাদি ব্যতিরিক্ত অন্য নানাবিধ বীজ ও ফল হইতেও তৈল প্রস্তুত হইয়াথাকে। এস্থলে বাহুল্যভয়ে তাহাদিগের বিবরণ সকল লিখিতে পারা গেল না।

কড্‌লিবর-অইল—প্রাণি-শরীর হইতে যে সকল তৈল প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে কড্‌লিবর-অইল সবিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রীন্‌লণ্ড, কানেডা প্রভৃতি দেশের সন্নিহিত উত্তর মহাসমুদ্রে কড্ নামক একজাতীয় মৎস্য জন্মে। ঐ দেশীয় লোকেরা নানা উপায়দ্বারা উক্ত মৎস্যসকল ধরিয়া উহাদিগের উদর হইতে যকৃত্‌ভাগ (মেটিয়া) বাহির করিয়া লয়। অনন্তর একটা বাজ্‌রাতে কতকগুলি তৃণ পত্রাদি পাতিয়া তদুপরি ঐ যকৃৎসকল প্রদান করত রৌদ্রে বসাইয়া রাখে। কিয়ৎক্ষণ রৌদ্র পাইলেই যকৃতের অভ্যন্তরস্থ তৈল দ্রবীভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত তৃণাদির মধ্য দিয়া গমন করত বিমল হইয়া নিম্নস্থাপিত পাত্র মধ্যে পতিত হয়। ইহাই উত্তম কড্‌লিবর-অইল। এই তৈল দেখিতে শুভ্র বা রক্তবর্ণ ও দুর্গন্ধ। নিয়মিত-রূপে ইহা খাইলে শরীরের পুষ্টি ও বলাধান হয়। শ্বাস, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের ইহা এক মহৌষধ। ফলতঃ জ্বর উদরাময় প্রভৃতি কতিপয় রোগ ভিন্ন সকল রোগেই ইহাদ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াথাকে।

অন্যান্য জলজন্তুগণের শরীর হইতেও তৈল পাওয়া

গিয়াথাকে। তন্মধ্যে তিমি-তৈলই অধিক ও অনেক কার্য্যোপযোগী। তিমির শরীরস্থ চর্ম্মের নিম্নে আদ হাত তিন পোওয়া গভীর বসা থাকে। ঐ সকল বসা কাটিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে রৌদ্রে দিলেই তৈল প্রাপ্ত হওয়াযায়। এই তৈলে উত্তম বাতি ও সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াথাকে।

পার্থিব তৈল—পারস্য, তুরস্ক, ইটালী, বর্ম্মা প্রভৃতি অনেকস্থানে ভূগর্ভ হইতে একপ্রকার তৈল নির্গত হয়। উহাকে পার্থিব (মেটে) তৈল কহে। ঐ সকল স্থানে গভীর কূপ খনন করিয়া রাখিলে চারি দিকের তৈলসকল জলের সহিত চোওয়াইয়া উহার অভ্যন্তরে একত্র হয়। অনন্তর উহার উপরিভাগ হইতে তৈলটা তুলিয়া লয়। এই তৈল নানাবর্ণ হয়। ইহা অনেক ঔষধের কার্য্য করে, প্রদীপেও জ্বলে।

বারুদ।

পিস্তল, বন্দুক, কামান প্রভৃতি যুদ্ধের প্রধান প্রধান শস্ত্র সকল কেবল এক বারুদের দ্বারাই কার্য্যকারী হয়। যে কামানের দ্বারা পাঁচ জন মনুষ্য সহস্র লোকের প্রাণ-বধ করিয়া রণজয় করিতেছে, যে কামানের দ্বারা ভয়ানক শৈল ও দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গসকল ক্ষণকাল মধ্যে সমভূমি করাযাইতেছে এবং যে কামানের শব্দ সকল শ্রুতিগোচর হইলে ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হয়—বারুদ না থাকিলে সেই কামান কোন কার্য্যকারক

হইত না। অতএব সমর-ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে বারুদ যেরূপ মহোপকারক পদার্থ, বোধ হয়, এরূপ আর কিছুই নাই।

বারুদ চূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ। বন্দুক ও কামানাদির অভ্যন্তরস্থ বারুদে আগুন দিলে উহা যে, সম্মুখস্থ গুলি গোলাকে প্রচণ্ডবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত করে, তাহার কারণ এই যে, বারুদ সাতিশয় বাষ্পাজনক পদার্থ; উহা অগ্নিসংযুক্ত হইবামাত্র বাষ্পময় হইয়া উঠে। বাষ্পের বিস্তারণশক্তি সাতিশয় প্রবল। যে বস্তু যে স্থানের মধ্যে থাকে, তাহা বাষ্প হইলে কখনই আর সেখানে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং বন্দুকের অভ্যন্তরস্থ বারুদেও আগুন দিলে উহা বাষ্পময় হইয়া সাতিশয় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং তন্মধ্যে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা পায়। কিন্তু বন্দুকের সকল দিকই বদ্ধ, কেবল যে দিকে গুলি দেওয়া থাকে, সেই দিক মাত্র খোলা; সুতরাং বাষ্প ঐ গুলিকে ঠেলিয়া সেই দিকেই ধাবমান হইয়া প্রচণ্ডবেগে গমন করে। গুলিসকল বন্দুক হইতে বহির্গত হইলে পর তাহাতে আর বাষ্পের বল থাকে না, কিন্তু উহা পূর্ব্বেই যে ধাক্কা পাইয়াছিল, তাহারই বেগে অতি দূরে যাইয়া পতিত হয়।

বারুদেরদ্বারা তুবড়ি, ব্যোম, হাউই প্রভৃতি যে সমস্ত আতোষবাজী প্রস্তুত হইয়াথাকে, বারুদের পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারিতাই তৎসকলের একমাত্র কারণ।

সোরা, গন্ধক ও অঙ্গার, ইহাহইতেই বারুদ প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহাদিগের ভাগপরিমাণ নানারূপ আছে। সচরাচর শতকরা ৭৬ ভাগ সোরা ১১ ভাগ গন্ধক ও

১৩ ভাগ অঙ্গার প্রদত্ত হইয়াথাকে। প্রথমতঃ ঐ তিন দ্রব্যকে পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া জল দিয়া একত্র মিশ্রিত করিতে হয়। অনন্তর ঐ মণ্ডকে উত্তমরূপে শুষ্ক ও চালনীদ্বারা চালিয়া দানার আকার করিয়া লইলেই বারুদ প্রস্তুত হয়।

অতি প্রাচীনকাল অবধি চীনদেশীয় লোকেরা বারুদের ব্যবহার অবগত ছিল, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উহা ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে যে, কোন্ সময়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কথিত আছে, মোগলেরাই বারুদের ব্যবহার এদেশে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন।

আবির।

আবির লোহিতবর্ণ চূর্ণ ও একপ্রকার ক্রীড়নক পদার্থ। নিতান্ত অজ্ঞলোকদিগের মধ্যে এইরূপ সংস্কার আছে যে, পূর্ব্বকালে যেস্থানে কুরুপাণ্ডবদিগের ভয়ানক সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই স্থানের মৃত্তিকা যুদ্ধহত সেনাদিগের শোণিতদ্বারা লোহিতবর্ণ হইয়া আছে এবং তাহাই এক্ষণে এদেশে আনীত হইয়া আবির রূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ইহা যে, নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা বলিবারই অপেক্ষা নাই—আবির নিম্নলিখিত রূপে মুর্শীদাবাদ, রাজসাহী মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রায় সকল জিলাতেই প্রস্তুত হইয়াথাকে।

আদার মত একপ্রকার গুল্মের মুলই আবিরের প্রধান উপাদান। ঐ সকল মূলকে স্থানবিশেষে বনআদা ও শঠী বলিয়াথাকে। রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রদেশের জঙ্গল মধ্যে প্রচুরপরিমাণে ঐ গাছ উৎপন্ন হয়। উহার মূলসকল মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করে এবং ছাঁকিয়া পালোর মত করিয়া লয়, ঐ পালোকে টিখোর বলে। আবির প্রস্তুত করিবার সময়ে ঐ টিখোরে মণকরা ৮ | ১০ সের লোধ কাষ্ঠের গুঁড়া মিশ্রিত করে। পরে বকম কাষ্ঠ ছেঁচিয়া জলের সহিত অগ্নিতে সিদ্ধ করত ছাঁকিয়া রক্তবর্ণ ক্বাথ বাহির করিয়া লয় এবং সেই ক্বাথে পূর্ব্বোক্ত লোধ্রমিশ্রিত টিখোর সকল নিক্ষেপপূর্ব্বক রঞ্জিত করে এবং ঐ রঞ্জিতচূর্ণ রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দেয়। শুষ্ক হইবার সময়ে উহাকে হস্তদ্বারা বিলক্ষণরূপে মর্দ্দন করে। এইরূপে শুষ্ক হইলে পর উহাকে পুনর্ব্বার বকমের ক্বাথে রঞ্জিত করিয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক ও মর্দ্দিত করে। এইরূপ ৪ | ৫ বার করা হইলে পর অর্দ্ধশুষ্ক ঐ রঞ্জিতচূর্ণ সকল তামাকের তালের ন্যায় তাল তাল বাঁধিয়া বোরার মধ্যে ৭ | ৮ দিন রাখিয়া দেয় এবং এইরূপ রাখাকে 'জাগান দেওয়া' কহে। জাগান দেওয়া হইলে উহার বর্ণ বিলক্ষণরূপে ঘোর হইয়া উঠে এবং তখন উহাকে রৌদ্রে শুষ্ক ও হস্তদ্বারা মর্দ্দিত করিয়া সূক্ষ্ম চালনীদ্বারা চালিয়া লয়। উৎকৃষ্ট আবির ভাল বস্ত্রের দ্বারা চালিয়া থাকে। একবার চালিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আবার হস্তদ্বারা মর্দ্দিত করিয়া পুনর্ব্বার চালিয়া লয়। এইরূপ বার বার হওয়ার পর যখন আর কোন রূপে চালনীর ছিদ্র দিয়া কিছু

নির্গত না হয়, তখন ঐ সিটাগুলিকে জাঁতাদ্বারা পিষিয়া লয় এবং তাহাই সোলা বা গালার ঠুলির অভ্যন্তরস্থ করিয়া সচরাচর কুঙ্কুমরূপে ব্যবহার করে। এ তদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট আবিরদ্বারাও কুঙ্কুম প্রস্তুত হয়।

ফাল্গুন মাসের দোলযাত্রার সময়ে আবির প্রচুর-পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াথাকে। তৎকালে দেববিগ্রহে ও বন্ধুবান্ধবদিগের গাত্রে আবির ছড়াইয়া দেওয়া যায়, কুঙ্কুমনিক্ষেপ করা যায়, ও আবিরগোলা জলে পিচ্‌কারি দেওয়া যায়। এই আমোদ ও ক্রীড়ার কার্য্য ভিন্ন আবির আর কোন বিশেষ প্রয়োজনে লাগে না। কেবল উহা কিছু টান বলিয়া, বিকারের রোগীর যখন অধিকপরিমাণে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, তখন দেশীয় চিকিৎসকেরা কখন কখন গাত্রে আবির মালিস করাইয়া থাকেন, এইমাত্র। সংস্কৃতভাষায় আবিরকে ফল্গু কহে, তাহা হইতেই বাঙ্গালায় উহার নাম ফাগু বা ফাগ্ হইয়াছে।

মসী।

মসী (কালী) লিখিবার প্রধান সাধন। মসী নানা প্রকার আছে। চোওয়ান তণ্ডুলের ক্বাথে ভূষা দিয়া বাঙ্গালামসী প্রস্তুত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু ঐ মসীতে কিঞ্চিৎ গঁদ গুলিয়া দিলে উহার চাক্‌চক্য আরও বৃদ্ধি হয়।

ইঙ্গরেজীমসী—ইহা নানাপ্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে। তন্মধ্যে ইহাই সহজ উপায়;—হরিতকী, টহরি,

বা আম্‌লা এই কয়েক কষায় দ্রব্য ভগ্ন করত একত্র করিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ সিদ্ধ হইলে পর ঐ জল ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে। তখন তাহাকে নামাইয়া ও ছাঁকিয়া হীরাকসচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই উত্তম মসী হয়। যদি ঐ জল লৌহ-পাত্রে সিদ্ধ করাযায়, তবে হীরাকস না দিলেও চলিতে পারে। কিন্তু উহাতে কিঞ্চিৎ গঁদ গুলিয়া দিলে উহার সমধিক উজ্জ্বলতা জন্মে।

রক্তমসী—ব্রেজিল উড্‌ বা বকম কাষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া জলযুক্ত বিনিগারের সহিত ৩।৪ দিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অনন্তর ঐ কাষ্ঠশুদ্ধ জলকে এক ঘন্টাকাল অগ্নিতে সিদ্ধ করত ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ গঁদ মিশাইয়া লইলেই রক্তমসী প্রস্তুত হয়। ঐ মসীতে কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি মিশাইয়া দিলে উহার বর্ণ অধিকতর উজ্জ্বল হয়।

হরিণ্মসী—দুই ভাগ বর্দ্দিগ্রীস, আট ভাগ জল ও এক ভাগ ক্রীম্‌টার্টর একত্র করিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করত অর্দ্ধভাগ থাকিতে নামাইয়া ও ছাঁকিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট হরিণ্মসী প্রস্তুত হয়।

স্বর্ণমসী—এই মসী প্রস্তুত করিতে হইলে সোণার পাতকে মধু দিয়া প্রস্তরের উপর উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হয়। বিলক্ষণ মর্দ্দিত হইলে পর উহাকে কোন জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া গুলিতে হয়। গুলিলেই স্বর্ণ, নিজের ভার প্রযুক্ত নীচে নামিয়া পড়ে এবং মধু জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর ঐ জল ফেলিয়া দিয়া স্বর্ণকে পুনর্ব্বার নূতন জল দিয়া গুলিতে হয়। এইরূপ বারংবার করিলে পর স্বর্ণে মধুর কিঞ্চিন্মাত্র সংস্রব থাকে

না। পরে ঐ স্বর্ণ-চূর্ণকে শুষ্ক করিয়া কিঞ্চিৎ গঁদজল মিশ্রিত করিলেই তদ্দ্বারা লিখিতে পারা যায়। ঐরূপে লিখিত অক্ষর কোন মসৃণ বস্তুদ্বারা সম্মৃষ্ট হইলে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষররূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। রোপ্য-মসীও এইরূপে প্রস্তুত হয়।

মুদ্রামসী—কাগজ পত্রের উপর সীল-মোহর করিবার মসীকে মুদ্রামসী কহে। মুদ্রামসী, দীপশিখাজাত ভূষা ও গর্জ্জন তৈল এই উভয়কে বিলক্ষণরূপে মর্দ্দন করত, প্রস্তুত করে। অনন্তর একটা বস্ত্রখণ্ডে ঐ মর্দ্দিত মসী মাখাইয়া স্তরে স্তরে রাখিয়া দেয়। পরে উহার উপর মোহর চাপিয়া উত্তোলন করত কাগজের উপর ভর দিয়া বসাইলেই উত্তম ছাপা উঠে।

মুদ্রা-যন্ত্র-মসী—যে মসীতে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়, তাহাকে মুদ্রা-যন্ত্র-মসী কহে। অত্যুষ্ণ মসিনাতৈল, কৃষ্ণরজন, সাবান, দীপ-শিখা-জাত ভূষা, গঁদ ও কিঞ্চিৎ নীল এই কয়েক দ্রব্যে উক্ত মসী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া অনেক।

প্রবাল ও স্পঞ্জ।

প্রবাল দেখিতে অতি সুন্দর। অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রবালকে রত্নবিশেষ জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাস্তবিকও রক্তবর্ণ মসৃণ উত্তম প্রবাল প্রায় বহুমূল্য প্রস্তরের সমানই শোভাজনক হয়। প্রবাল এক প্রকার কীটের আবাসমাত্র। এই কীটগণের আকার নানারূপ; ঐ সকল কীটকে কোন কোন অবস্থায় প্রাণী এবং কোন কোন

অবস্থায় অবিকল উদ্ভিজ্জের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। ইহারা সহস্র সহস্র একত্র হইয়া গভীর সাগরের অভ্যন্তরে আপনাদিগের শরীরনিঃসৃত এক প্রকার রসের দ্বারা প্রস্তরাদির উপরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেকে আপন আপন বাসের নিমিত্ত এক একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কিছুকাল অবস্থান করত মরিয়া যায়। কিন্তু তথনও অপরাপর কীটেরা পূর্ব্বোক্ত কীটদিগের গৃহের উপরিভাগে বাসা নির্ম্মাণ করিতে বিরত হয় না।।

এইরূপে ঐ বাসাসকল উপর্য্যুপরিভাবে অবস্থিত হওয়াতে শাখাশূন্য বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বোধ হয় এই নিমিত্তই কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহারা বিক্রুমলতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক ঐরূপ আবাস সকল এক স্থানে অনেক হইয়া উঠিলে তথায় প্রকাণ্ড দ্বীপ হয়।

প্রবাল।

ভারতীয় ও প্রশান্ত মহাসাগর প্রভৃতি অনেকস্থানে প্রবাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের প্রবালই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তথাকার পর্ব্বতাদির গাত্রে যে সকল প্রবাল উৎপন্ন হয়, লোকেরা অনেক আয়াসে তাহা ভাঙ্গিয়া আনে এবং উপযুক্তরূপ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া মসৃণ করে।

প্রবাল তিনপ্রকার বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্ত, পীত ও শ্বেত। তন্মধ্যে রক্তবর্ণ প্রবালেই কামিনী-গণের নানারূপ অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াথাকে। অস্ম-দ্দেশীয় চিকিৎসক মহাশয়েরা কোন কোন ঔষধে প্রবাল ও তাহার ভস্ম ব্যবহার করিয়াথাকেন।

স্পঞ্জ—অতিশয় সচ্ছিদ্র, স্থিতিস্থাপক, কোমল ও দেখিতে শুষ্ক শৈবালের ন্যায়। সচ্ছিদ্রতা নিবন্ধন স্পঞ্জ অনেক জল চুষিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু নিষ্পীড়ন করিলেই সমুদায় পড়িয়া যায়।

পূর্ব্বে স্পঞ্জ উদ্ভিজ্জমধ্যে পরিগণিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ উপায় দ্বারা ইহার আকার প্রকার সকল পরীক্ষা করত ইহাকে প্রাণি-মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, অতি সূক্ষ্ম এক প্রকার সামুদ্রিক কীট আপনাদিগের আবাসের নিমিত্ত শরীরজ পদার্থবিশেষেরদ্বারা ঐ স্পঞ্জ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

ভূমধ্যসাগরের তলভাগে শৈলাদির উপর অনেক স্পঞ্জ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডুবুরিরা মগ্ন হইয়া ঐ সকল স্থানে গমন করত ছুরিকাদ্বারা কাটিয়া আনে। স্পঞ্জ ডাক্তরদিগের অনেক ব্যবহারে আইসে। শরীরের যে স্থানে শোণিতপাত হইতে থাকে, তথায় একখণ্ড স্পঞ্জ বসাইয়া দিলে রক্তবন্ধ হয়। ক্লিন্ন ক্ষতভাগে স্পঞ্জ বসাইয়া রাখিলে অনেক উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্যেও স্পঞ্জ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আতর ও গোলাব-জল।

সুগন্ধি পুষ্পমাত্রেরই তৈলকে আতর কহে। ইহা সকল ফুল হইতেই প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গোলাবফুলের আতর অধিক প্রসিদ্ধ এবং অতিশয় সুরভি। সৌরভসম্পাদন ব্যতিরেকে ইহাদ্বারা প্রায় অপর কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

আতর প্রস্তুত করিবার প্রণালীও নিতান্ত কঠিন নহে। গোলাবের দল সকল ও তাহার দ্বিগুণ জল একত্র স্থালীমধ্যে রাখিয়া নিম্নে উত্তাপ প্রদান করত, (পূর্ব্বে আলকাতরা চোওয়াইবার বিষয় যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপে) চোওয়াইতে হয়। ঐ চোওয়ানজলে পুনর্ব্বার নূতন পুষ্পদল দিয়া আবার উহাকে চোওয়াইয়া লইতে হয়। এইরূপ চারি পাঁচ বার করিলে ঐ চোওয়ান জল উত্তম সুগন্ধি হয়, এবং উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাবজল। উহা হইতে আতর বাহির করিতে হইলে ঐ জল অনাবৃত প্রশস্ত পাত্র সকলে ঢালিয়া সমস্ত রজনী শীতল বায়ুতে রাখিয়া দিতে হয়। উহার উপরিভাগে ধূলি বা কীট পতঙ্গাদি না পড়ে, এই জন্য অতি সূক্ষ্ম একখান রেসমের আর্দ্রবস্ত্রে উহা আচ্ছাদন করিয়া রাখে। প্রাতঃকালে দৃষ্ট হয় যে, উহার উপরিভাগে তৈলের একটী অতি সূক্ষ্ম সর পড়িয়া রহিয়াছে। অনন্তর অতি সাবধানতাপূর্ব্বক পালক বা তূলাদ্বারা ঐ তৈল সকল একত্র জমা করিয়া লইতে হয়। এইরূপ দুই তিন দিন করিলেই সমুদয় তৈল প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু তখনও ঐ জল গোলাবজলরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। গোলাবজলে আতরের যত অধিক অংশ থাকে, ততই উৎকৃষ্ট হয়। গোলাবজল অতিশয় স্নিগ্ধ।

পারস্য, তুরস্ক ও ভারতবর্ষের গাজীপুর প্রভৃতিস্থানে অনেক আতর গোলাব প্রস্তুত হইয়াথাকে। ঐ সকল-দেশ অতিশয় উষ্ণ এবং ওখানে গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের কিরণও অতি প্রচণ্ড। এই নিমিত্ত ঐ সকল দেশে না। চোওয়াইয়া সূর্য্যের উত্তাপে এক প্রকার আতর প্রস্তুত করিয়া থাকে—অর্থাৎ পরিষ্কৃত মৃণ্ময়ভাণ্ডে গোলাবের দলসকল জলে ডুবাইয়া প্রাতঃকালে রৌদ্রে বসাইয়া রাখে। সমস্ত দিবাভাগে সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ ইহাতে পতিত হইলে পর সন্ধ্যার সময়ে ঐ পাত্র আচ্ছাদিত করত গৃহমধ্যে আনয়ন করে। এইরূপ ৪ | ৫ দিন করিলেই অতি সূক্ষ্ম পীতবর্ণ তৈলের অংশসকল ঐ জলের উপর ভাসিয়া উঠে। সপ্তাহ পরে ঐ তৈল অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ঘন হয়। তখন্ উহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারেতুলিয়া লইয়াথাকে।

যেরূপে গোলাবপুষ্প চোওয়াইয়া আতর গোলাব প্রস্তুত হয়, মল্লিকা জাতি লবঙ্গ প্রভৃতিপুষ্প ও দারুচিনি জায়ফল প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য হইতেও সেইরূপে এক প্রকার তৈল ও জল প্রাপ্ত হওয়াযায়। যে পুষ্পের যেরূপ গন্ধ, তদুদ্ভব তৈলেও তাহার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইয়াথাকে।

হীরক।

হীরক সাতিশয় উজ্জ্বল ও বহুমূল্য রত্নবিশেষ। অন্যান্য রত্নের জ্যোতিঃ নূতন বেলায় যেরূপ থাকে, ব্যবহৃত হইলে সেরূপ থাকে না এবং নিকটে যেরূপ দৃশ্যমান হয়, দূর হইতে সেরূপ দেখায় না। কিন্তু হীরককে সর্ব্বাবস্থাতেই এবং সর্ব্বস্থান হইতেই সমান জ্যোতির্ম্ময় দেখিতে পাওয়াযায়। বোধ হয়, এই জন্যই হীরক

এতাদৃশ বহুমূল্য। হীরকের মূল্য যে কত অধিক হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। অস্মদ্দেশে একটী কথা আছে "সাত রাজার ধন এক মাণিক!" বোধ হয় হীরককে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবাদ রচিত হইয়া থাকিবে। বাস্তবিকও হীরকের তুল্য বহুমূল্য দ্রব্য আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এক এক খণ্ড হীরকের মূল্য ৫। ৭ কোটি টাকাও নির্দ্ধারিত হয়।

হীরক এরূপ কঠিন যে, অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা ইহাকে কাটিতে পারা যায় না। হীরককে কেবল হীরকের দ্বারাই কাটা গিয়াথাকে।

হীরক খনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য খনিজ পদার্থের ন্যায় সুলভ নহে। আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী ব্রেজিল এবং ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডা, সম্বলপুর, বুন্দেল-খণ্ড ও কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী কালুর প্রভৃতি এই কয়েক নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতিরিক্ত পৃথিবীর প্রায় অন্য কোন খনিতে হীরক পাওয়াযায় না। হীরক যৎকালে খনি হইতে উঠে, তখন উহার তাদৃশ উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হয় না। অনন্তর উহাকে অন্য হীরকের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া ও কাটিয়া লইলে পর রমণীয় চাক্‌চক্যশালী হইয়া উঠে। হীরক কাটিতে অতিশয় নিপুণতা আবশ্যক করে। কাটিবার গুণেই হীরকের উজ্জ্বলতার সুতরাং মূল্যেরও তারতম্য হইয়াথাকে। স্বর্ণ রৌপ্যাদির মূল্য যেরূপ নিয়মিত আছে—অর্থাৎ ১ ভরি স্বর্ণের দাম যদি ১৬ টাকা হয়, তবে ২ ভরির দাম ৩২ টাকা, ৩ ভরির দাম ৪৮ টাকা ইত্যাদি—হীরকের মূল্যনিরূপণের সেরূপ নিয়ম নাই। উহার এক গুণ পরিমাণের মূল্য যত হয়, দ্বিগুণাদির মূল্য, উক্ত দ্বিসঙ্খ্যাদির বর্গ প্রথমমূল্য দ্বারা গুণিত হইলে যত

হয়, তত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি ১ রতি হীরকের মূল্য ২০ টাকা হয়, তবে মিলিত দুই রত্তির মূল্য ২×২×২০ =৮০ টাকা, তিন রত্তির মূল্য ৩×৩×২০=১৮০ টাকা ইত্যাদি। হীরক রক্ত পীত হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণের আছে। কিন্তু বর্ণহীন নির্ম্মল হীরা যেরূপ উজ্জ্বল ও বহু-মূল্য তেমন আর কিছুই নহে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক খণ্ড, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। হীরকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা কাচ কাটা-যায়। উৎকৃষ্ট প্রস্তর সকলের কর্ত্তন ও সংস্কার করণে হীরকের এবং হীরকচূর্ণের সাতিশয় উপযোগিতা আছে। যাহাহউক, হীরকের মূল্য যত অধিক, তাহার অনুরূপ প্রয়োজন কিছুই নাই।

অস্মদ্দেশে কহিনুর নামে এক অতি উৎকৃষ্ট হীরক ছিল। উহার মূল্য সাড়ে তিন কোটি টাকা। উহা এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটোপরি শোভমান হইতেছে। প্রবাদ আছে যে, এই মণি আমাদিগের প্রাচীন সূর্য্য-বংশীয় রাজাদিগের ছিল—অর্থাৎ অগস্ত্য ঋষি রামচন্দ্রকে যে মণি প্রদান করিয়াছিলেন ইহাই সেই মণি। মুসল-মানেরা এ দেশ অধিকার করিলে পর উহা তাহাদিগের অধিকৃত হইয়া ক্রমশঃ লাহোরাধিপতি রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয়। অনন্তর তথা হইতেই ইঙ্গলণ্ডে নীত হইয়াছে।'

হীরক যত বহুমূল্য হউক না কেন, লোকে হীরকখণ্ডের অলঙ্কার ধারণ করিয়া যতই গর্ব্ব করুক না কেন, হীরক কয়লা ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। রসায়নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, কয়লা যে উপাদানে নির্ম্মিত হয়, হীরকও কেবল সেই উপাদানে প্রস্তুত হইয়া থাকে!

পরিশিষ্ট।

বাচনিক বস্তুবিদ্যাশিক্ষার উপায়।

প্রথমতঃ বালকদিগকে গ্যালারিতে উপবেশন করাইয়া বা শ্রেণীবন্ধে দণ্ডায়মান করাইয়া শিক্ষক একখণ্ড কাচ লইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন—আমার হাতে এখানি কি?

বালকেরা উত্তর করিবে—কাঁচ।

শিক্ষক, শোধন করিয়া দিবার জন্য কহিবেন 'কাঁচ' নয়—কাচ।—আচ্ছা তোমরা এই শব্দটী বানান কর দেখি?

তাহারা বানান করিলে পর শিক্ষক সম্মুখে একখানি বোর্ড বা স্লেট রাখিয়া তাহার উপরিভাগে বড় বড় অক্ষরে 'কাচ' এই শব্দটী লিখিয়া দিবেন, এবং পরে কাচখানিকে আলোকের দিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, কাচখানি কেমন দেখাইতেছে বল?

বা। চক্‌চকে।

শি। হাঁ—চক্‌চকে—উজ্জ্বল (এই বলিয়া উজ্জ্বল শব্দটী বোর্ডে কাচের নিম্নে লিখিয়া দিবেন(——এই খানির উপর তোমরা হাত দিয়া দেখ দেখি, কেমন বোধ হয়?

বা। (হাত দিয়া) হিম—ঠাণ্ডা।

শি।—শীতল (পূর্ব্ববৎ বোর্ডে লিখন)—তোমরা এই খানির উপর হাত বুলাইয়া দেখ—কেমন ঠেকে?

বা। (হাত বুলাইয়া)—তেলপারা।

শি। তেলপারা অর্থাৎ যাহা খস্‌খসে নয়—তাহাকে ভাল কথায়?—মসৃণ কহে। তবে কাচ?

বা। মসৃণ। (মসৃণ শব্দের পূ. লি.)

শি। আর কোন মসৃণ বস্তু দেখিয়াছ?

বা। স্লেট কাগজ ঘটী বাটী ইত্যাদি।

শি। এই ধূলাগুলি, এই জল টুকু ও এই কাচখানি এক স্থানে রাখিয়া দেখ—কাচখানির এক দিক ধরিয়া তুলিলে সমুদয়টি উঠে—জলের বা ধূলার তা হয়?

বা। না—কাচ শক্ত, জল ও ধূলা যে শক্ত নয়।

শি। হাঁ কাচ কঠিন; যাহার এক দিক্ ধরিয়া তুলিলে সমুদয় উঠে তাহাকে কঠিন কহে। (কঠিন শব্দের পূ. লি.)—এই পয়সাটী বা এই ছুরী খানি যদি উঁচু হইতে ফেলিয়া দিই, তবে কি হইবে?

বা। কিছুই হইবে না।

শি। যদি কাচ খানি ফেলিয়া দিই?

বা। ভাঙ্গিয়া যাইবে।

শি। কেন?

বা। কাচ পল্‌কা—ঠুন্‌কো।

শি। পল্‌কা বা ঠুন্‌কো জিনিস্‌কে ভঙ্গ-প্রবণ কহে—তবে কাচ?

বা। ভঙ্গ-প্রবণ (এই শব্দের বানান করান ও পূ. লি.)

শি। তোমরা আপন আপন স্লেট বা বহি চক্ষুর উপর দিয়া দেখ—কিছু দেখিতে পাও?

বা। না।

শি। কেন?

বা। স্লেটে চোক্ ঢাকা পড়ে।

শি। স্লেট বা বহিতে চক্ষু ঢাকা পড়ে অর্থাৎ তাহার ভিতর দিয়া আলো আইসে না, কাচের ভিতর দিয়া আইসে—যে বস্তুর ভিতর দিয়া আলো আইসে, তাহাকে স্বচ্ছ বলে। তবে কাচ?

বা। স্বচ্ছ (স্বচ্ছ শব্দের বানান ও পূ. লি.)

শি। তোমরা আর কোন স্বচ্ছ বস্তু দেখিয়াছ ?

বা। অভ্র—জল—মাছের পট্‌কা।

শি। এবং বায়ু।—পিত্তলের বা লোহার হাতার এক দিক্ আগুনে তাতাইলে সমুদয় তাতিয়া উঠে। কিন্তু এই অল্প কাচ টুকুরার একদিক্ প্রদীপের শীষে তাতাইলাম—দেখ, তথাপি সমুদয়টী তাতে নাই।

বা। (হাত দিয়া)-না।

শি। যে বস্তুর এক দিক্ তাতাইলে সমুদয় তাতে, তাহাকে—পরিচালক কহে. আর যাহা তাতে না, তাহাকে—অপরিচালক—তবে কাচ ?

বা। অপরিচালক (পূ. লি.)

এইরূপে কাচ স্বাদ-হীন ও গন্ধ-হীন, তাহা বালকদিগকে প্রত্যক্ষ করাইয়া ক্ষারও বালিতে কাচের উৎপত্তি হয়, কাচে চস্‌মা গেলাস্ লণ্ঠন্ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এবং কাচের পৃষ্ঠে পারা মাখাইলে দর্পণ হয়, এ সকলও উত্তমরূপে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অপরাপর বস্তু সকলেরও শিক্ষা দিতে হইবে; কিন্তু তত্তৎস্থলে সেই সেই বস্তুর অপর অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ গুণ যে গুলি আছে, তাহাদেরই পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবে, সমুদয়ের পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

রবর।

কৃষ্ণবর্ণ
অস্বচ্ছ
কোমল
স্থিতিস্থাপক
দুশ্ছেদ্য
সূত্রক (১)
দাহ্য
ইহারদ্বারা পেন্সিলের দাগ উঠে এবং ফিতা জুতা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়।

অহিফেন।

কৃষ্ণবর্ণ
দুর্গন্ধ
তিক্ত
পিচ্ছিল
মাদক
ভৈষজ্য (২)

হিঙ্গু।

কপিশবর্ণ
পিচ্ছিল
দুর্গন্ধ

১ যাহা হইতে সূত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে সূত্রক কহে।
২ যাহা ঔষধে লাগে তাহাকে ভৈষজ্য কহে।

কটু

তিক্ত

ভৈষজ্য

সুস্বাদুবোধে অনেকে হিঙমিশ্রিত ব্যঞ্জনাদি আহার করে। ইহাতে অনেক ঔষধ হয়।

চন্দনকাষ্ঠ।

সুগন্ধি

আতিক্ত (৩)

সতৈল (৪)

দাহ্য

ভৈষজ্য

চন্দনকাষ্ঠের দ্রব্য উত্তম পালিস হয়, ইহার তৈল অনেক রঙে লাগে, ঘৃষ্ট চন্দনে আমাদের দেবার্চ্চনা হয়।

টার্পিন।

তরল

উজ্জ্বল

আস্বচ্ছ (৫)

তীব্রগন্ধি

তিক্ত

উদ্বায়ী

---

৩ ঈষৎ তিক্তকে আতিক্ত বলাযায়।

৪ যাহার মধ্যে তৈল থাকে তাহাকে সতৈল কহে।

৫ ঈষৎ স্বচ্ছকে বলে।

ক্রিমিনাশক
ইহা অনেক রঙে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

কাগজ।

নানা-বর্ণ
পত্রাকার
কোমল
মসৃণ
সচ্ছিদ্র
দাহ্য
লেখ্য

মৃগনাভি।

সুগন্ধি
কর্করিল (৬)
ভৈষজ্য
কক্ষম
পুষ্টিকর

রেসম।

নানা-বর্ণ
কোমল
স্থিতিস্থাপক
শক্ত

৬ দানাদারকে কর্করিল কহে।

অপরিচালক
দাহ্য
প্রাণিজ
ইহাতে নানাবিধ বস্ত্র হয়।

গালা।

আরক্ত বর্ণ
কঠিন
অগ্নিদ্রবার্হ (৭)
চূর্ণনীয় (৮)
জলাযোজ্য (৯)
প্রাণিজ
ইহাতে কড় চুড়ি প্রভৃতি নির্ম্মিত এবং কাগজ পত্র আঁটা হয়।

শৃঙ্গ।

বক্র
খর্ব্বুর
সূচীমুখ
কঠিন
তাপনম্য (১০)
আস্বচ্ছ

---

৭ যাহা অগ্নিতে গলে তাহাকে অগ্নিদ্রবার্হ বলাযায়।
৮ যাহাকে গুঁড়া করা যায়।
৯ যাহা জলের সহিত মিশে না।
১০ যাহাকে তাতাইয়া নোয়ানযায়।

শূন্যগর্ব্ভ
ইহারদ্বারা চিরুণি, খড়গের বগুলা, ছুরির বাঁট ছাতির হাতল প্রভৃতি হয়।

ঊর্ণা।

কোমল
স্থিতিস্থাপক
দুশ্ছেদ্য
অপরিচালক
স্থায়ী
ইহাতে বনাত শাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

মম।

আপীত
ঘন
পিচ্ছিল
কোমল
দুশ্ছেদ্য
অগ্নিদ্রবার্হ
ইহাতে বাতি তয়।

স্বর্ণ। (১১)

পীতবর্ণ

---

১১ রূপা, সীসা, তামা, লৌহ, রাঙ ও দস্তা ইহারা সকলেই প্রায় এইরূপ, কেবল বর্ণের ও কার্য্যের কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। অতএব তাহা আর পৃথক্ লিখিত হইল না।

উজ্জ্বল
সুশ্রী
ভারী
ভারসহ
ঘাতসহ
সূত্রক
অগ্নিদ্রবার্হ
আনম্য
খনিজ
ইহাতে সূক্ষ্ম তার, পাতলা পাত, মুদ্রা ও অলঙ্কার প্রভৃতি হয়।

গন্ধক।

পীতবর্ণ
কঠিন
ভঙ্গপ্রবণ
দাহ্য
জলাযোজ্য
খনিজ
ইহাতে দীপশলাকা ও অনেক ঔষধ হয়।

পারদ।

শুক্লবর্ণ
উজ্জ্বল
তরল

আবশ্যক সময়ে তাহা মূল হইতে অনায়াসে বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

শীতল

সুবিভাজ্য

খনিজ

কাচের পৃষ্ঠে পারা দিলে দর্পণ হয়।

অভ্র।

স্বচ্ছ

উজ্জ্বল

সস্তর ১২

চূর্ণনীয়

অদাহ্য

খনিজ

ইহাতে পাকের স্থালী ও প্রতিমা সাজান হয়।

লবণ।

শ্বেতবর্ণ

উজ্জ্বল

কর্করিল

লাবণিক ১৩

দ্রবণীয়

ইহাদ্বারা খাদ্য সুস্বাদু হয়।

কর্পূর।

শুভ্রবর্ণ

উজ্জ্বল

১২ যাহা স্তরে স্তরে অর্থাৎ থাকে থাকে রহে।

১৩ লোনতা।

সুগন্ধি
আতিক্ত
লঘু
দাহ্য
উদ্বায়ী
ভৈষজ্য
ইহাদ্বারা অন্য দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

কুইনিন্।

শুভ্রবর্ণ
উজ্জ্বল
চূর্ণ
তিক্ত
জ্বরঘ্ন
বল্কজ

স্পঞ্জ।

কোমল
স্থিতিস্থাপক
দুশ্ছেদ্য
সচ্ছিদ্র
শোষক
নম্য
প্রাণিজ
ইহারদ্বারা ক্ষতস্থান পরিষ্কৃত হয়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।